মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

অক্টোবর-২০২৪
বর্ষ-৪৪ | সংখ্যা-১

আল্লাহর পথে সম্পদ দান

ইসলামে যুলম ও যালিমের পরিণতি

মধ্যমপন্থা: ইসলামের অনন্য সৌন্দর্য

স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা

মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

অক্টোবর ২০২৪
আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩১
রবি'উল আউয়াল-রবি'উস সানি ১৪৪৬

বর্ষ-৪৪
সংখ্যা-০১

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩

দারসুল কোরআন

ইসলামে যুলম ও যালিমের পরিণতি
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৪

জীবনকথা ॥

সালমা মাওলাতু রাসূলিল্লাহ (সা)
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ॥ ১৩

চিন্তাধারা

মধ্যমপন্থা : ইসলামের অনন্য সৌন্দর্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক ॥ ১৭

বিগত সরকারের ধর্ম ও নৈতিকতাহীন শিক্ষানীতি : আমাদের সচেতনতা
প্রফেসর আর. কে. শাব্বীর আহমদ ॥ ৩১

স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥ ৩৭

আল্লাহর পথে সম্পদ দান
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ তৌহিদ হোসাইন ॥ ৪৭

আন্তর্জাতিক

ভিয়েতনাম : কমরেডদের বোধোদয়
মীযানুল করীম ॥ ৫৫

প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৮

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫

সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম বা জামানত পাঠাতে হয়।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

দেশের নাম	সাধারণ	রেজিঃ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

৩. গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মনি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা)-এর নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ বিকাশ মার্চেন্ট নাম্বারে পেমেন্ট করুন -০১৭৩২৯৫৩৬৭০
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী গবেষণা পত্রিকা "মাসিক পৃথিবী"। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবী ৪৪তম বর্ষে পদার্পণ করল, আলহামদুলিল্লাহ। এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পৃথিবীর যাত্রা পথ সব সময় মসৃণ ছিল না। মাঝে মাঝে প্রতিকূল পরিবেশও মোকাবেলা করতে হয়েছে। বিশেষ করে ২০১১ সাল থেকে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত সময়কাল। এ সময় পৃথিবীকে বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। মাঝে মধ্যে পরিস্থিতি এতটাই সংকটজনক হয়েছে যে, পৃথিবী হাতে নিয়ে পথচলাও দুষ্কর ছিল। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর পথ চলা কখনো বন্ধ হয়নি। হোঁচট খেলেও যাত্রা বিরতি হয়নি। শঙ্কা, সংকট প্রভৃতি নিয়ে পৃথিবী পথ চলেছে। এ দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর কর্মকর্তা-কর্মচারী, এজেন্ট, পাঠক এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই চরম ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। সংকট কালে যারা পৃথিবীর সাথে ছিলেন, তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

মাঝে মধ্যে পরিস্থিতি এতটাই সংকটজনক হয়েছে যে, পৃথিবী হাতে নিয়ে পথচলাও দুষ্কর ছিল। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর পথ চলা কখনো বন্ধ হয়নি। হোঁচট খেলেও যাত্রা বিরতি হয়নি।

বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। গত ৫ আগস্ট, ২০২৪ ছাত্র গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী সরকারের পতন হয়েছে। ফলে আমরা উদার উন্মুক্ত ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে পেয়েছি। স্বৈরাচারের নাগ পাস ছিন্ন করে আমরা মুক্ত স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ পেয়েছি। এখন আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে সমুন্নত করতে হবে এবং সমৃদ্ধ দেশ গড়ার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যেতে হবে। স্বৈরাচারের কবল থেকে গণতন্ত্রের মুক্তির ফলে "মাসিক পৃথিবী"ও মুক্ত পরিবেশ পেয়েছে। তাই যারা এ নতুন স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন এবং যারা কারাবরণ করেছেন ও ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন করেছেন, সে সকল ছাত্র-জনতাকে পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে পৃথিবীর কর্মকর্তা, কর্মচারী, এজেন্ট, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক, পরামর্শদাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আশাকরি ভবিষ্যতে আমাদের পথচলা আর বাধাগ্রস্থ হবে না, ইনশাআল্লাহ। পৃথিবীর ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দেশবাসীকেও আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং পৃথিবীর সফলতার জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও দু'আ কামনা করছি। ■

ইসলামে যুলম ও যালিমের পরিণতি

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم

{فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ}

অনুবাদঃ অতঃপর তাদের মধ্যে যারা যালিম ছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বললো। কাজেই আমরা আসমান থেকে তাদের প্রতি শাস্তি পাঠালাম, কারণ তারা যুলম করত', [আল আ'রাফ- ৭: ১৬২]।

নামকরণঃ সূরাটির ৪৬নং আয়াতে উল্লেখিত {وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ} শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানকে 'আল-আ'রাফ' বলা হয়।

নাযিলের প্রেক্ষাপটঃ এটি একটি মাক্কী সূরা। তবে ১৬৩-১৭০ পর্যন্ত মোট ৮টি আয়াত মাদানী, [তাফসীরুল কুরুতুবী ৭/১৬০, কারো কারো মতে ১৬৩-১৬৭ এই ৫টি আয়াত মাদানী, তাফসীরুল বাগাভী ২/১৭৯]।

মূলবিষয়বস্তুঃ নাবুওয়াত ও রিসালাত কবুল করার আহ্বান, পরকালের সত্যতা, পরকালে অবিশ্বাসীদের পরিণতি এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কথোপকথন, নূহ ('আ)সহ অন্যান্য নাবীগণের ঘটনার বিবরণ হচ্ছে এ সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ পূর্বের আয়াতগুলোতে মূসা ('আ)এর সম্প্রদায় বানূ ইসরাঈলের মধ্যে একদল সত্যপন্থী ছিল যারা সত্যের অনুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা যেমন মূসা ('আ)এর সময়ও ছিল আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ও তাদের কিতাবের সুসংবাদ অনুসারে তার প্রতি ঈমান আনে ও তার যথাযথ অনুসরণও করে। আর অপর অংশটি বাছুর পুজার অপরাধসহ নানা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল। তারা আল্লাহ তা'আলার সত্য দীন ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে অসদাচারণ করেছে, সীমালংঘন করেছে এবং নিজেদের প্রতি যুলম করেছে। ফলে মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ 'অতঃপর তাদের মধ্যে যারা যালিম ছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বললো'। এ আয়াতে যুলমকারীদের কথা বলা হয়েছে এবং যুলম করার কারণে তাদের উপর কঠিন শাস্তি আরোপের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অনুরূপ আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ}

'অতঃপর যালিমরা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বললো। কাজেই আমরা যালিমদের প্রতি তাদের অবাধ্যতার কারণে আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করলাম', [আল বাকারাহ- ২:৫৯]। আয়াতে উল্লেখিত যালিমরা যে কথাটিকে পরিবর্তন করেছিল তা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ বানূ ইসরাঈলকে একটি জনপদে নতশিরে প্রবেশ করার নির্দেশের সাথে আরো বলেছিলেন, {وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ} 'আর বলো: ক্ষমা চাই। আমরা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব', [আল-বাকারাহ- ২:৫৮]। অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে কথা ও কাজের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করার জন্য নতশিরে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা মাথা উঁচু করে তাদের পাছার উপর ভর করে প্রবেশ করে। তাদেরকে আর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা এমতাবস্থায় ঢুকবে আর মুখে বলবে, حِطَّةٌ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের থেকে গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। কিন্তু তারা তা না বলে ব্যঙ্গ ও ঠাট্টা করে বলেছিল, حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ অর্থাৎ চুলের মধ্যে দানা, বা حِنْطَةٌ فِي شُعَيْرَةٍ অর্থাৎ চুলের মধ্যে গম। [সাহীহুল বুখারী ৪/১৫৬, নং ৩৪০৩, সাহীহ মুসলিম ৪/২৩১২]। বস্তুতঃ এ কথার দ্বারা তাদের কোন আসল উদ্দেশ্য নেই; কারণ এর কোন অর্থ হয় না। তবে তারা এটা আল্লাহর নির্দেশের বিরোধীতা এবং তাঁর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের জন্যই এই ব্যঙ্গ করেছিল। এ জন্যে তাদেরকে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে, [তাফসীর ইবন কাসীর ১/২৭৫, ২৭৬, ফাতহুল কাদীর ১/১০৬, আদওয়াউল বায়ান ৭/২৭৮]। উল্লেখ্য যে, এতটুকু পরিবর্তন অর্থাৎ 'হিত্তাতুন' এর স্থানে 'হিনতাতুন' বা 'হাব্বাতুন' বলার জন্য তাদেরকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখী হতে হয়েছে। কারণ এ শব্দগুলো দ্বারা ব্যঙ্গ করা ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও দীনের মধ্যে পরিবর্তন আনলে সেটির শাস্তি কত মারাত্মক হবে তা সহজেই অনুমেয়, [তাফসীরুল কুরতুবী ১/৪১৫]।

ظُلْمٌ 'যুলম' মারাত্মক একটি অপরাধ। এর শাস্তিও ভয়াবহ। প্রকৃতপক্ষে 'যুলম' সকল ভালকাজ ধ্বংস করে দেয়, যাবতীয় বরকত ও কল্যাণ মুছে ফেলে, ধ্বংস ডেকে আনে। শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং অবাধ্যতা ও সম্পর্ক ছিন্নের কারণ ঘটায়। যে জাতি ও সমাজে 'যুলম' এর ব্যাপক প্রসার ঘটে, তা জাতিকে ধ্বংস করে দেয় এবং সমাজ ও

রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। 'যুলম' ব্যক্তি, সামষ্টিক ও জাতীয়ভাবে সংঘটিত হয়। 'যুলম' এর আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে তার যথাযোগ্য স্থানে না রেখে ভিন্ন স্থানে রাখা। অন্যের অধিকারের উপর চড়াও হওয়া। শারী'য়াত নির্ধারিত সীমা ও বিধানসমূহ অতিক্রম করা ও লংঘন করা। তাই যাবতীয় পাপ ও অপকর্ম যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহুর অবাধ্যতা করা হয় তাকেই 'যুলম' বলা হয়। আর সবচেয়ে বড় 'যুলম' হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শিরক করা। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ}

'হে প্রিয় ছেলে! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক মস্তবড় যুলম', [সূরা লুকমান ৩১: ১৩]। মানুষ কখনো নিজের উপর যুলম করে এবং অন্যের উপরেও যুলম করে। যে ব্যক্তি গুনাহর কাজ করে সে নিজের উপর যুলম করে। এ জন্যে গুনাহ মাফ চাওয়ার সময় নিজের প্রতি যুলম করেছি বলে স্বীকৃতি দিতে হয়। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ}

'তারা বললেন, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের প্রতি যুলম করেছি। আর আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমারদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো', [আল আ'রাফ- ৭:২৩]।

মহিমান্বিত আল্লাহ ইনসাফ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যুলম, উৎপীড়ণ ও সীমালংঘন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ}

'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, ইহসান (সদাচারণ) ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন থেকে নিষেধ করেন', [আন নাহল- ১৬:৯০]। وَالْبَغْيِ শব্দটির অর্থ সীমালংঘন করা, যুলম করা ও উৎপীড়ণ করা বোঝানো হয়, [তাফসীরুল বাগাভী ৩/৯৩]।

আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে এসেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা থেকে বর্ণনা করে বলেন,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا

'হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার উপর যুলম করাকে হারাম করেছি এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুলমকে হারাম করেছি। কাজেই তোমরা পরস্পর পরস্পরকে যুলম করবে না', [সাহীহ মুসলিম ৪/১৯৯৪, নং ২৫৭৭]। আল্লাহ তা'আলা ন্যায়-পরায়ণকে পছন্দ করেন আর যালিমকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ}

'আর ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালোবাসেন', [আল-

হুজুরাত- ৪৯: ৯]। তিনি যালিমদেরকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ} 'আর আল্লাহ যালিমদেরকে ভালোবাসেন না', [আল 'ইমরান- ৩:৫৭]। যালিমগণ ব্যর্থ হয়, সফল হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ}

'যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তাঁর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় যালিমরা সাফল্য লাভ করতে পারে না', [আল-আন'আম- ৬:২১]।

যুলম ও যালিমের পরিণতি: মহান আল্লাহ বলেন, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُوْنَ 'কাজেই আমরা আসমান থেকে তাদের প্রতি শাস্তি পাঠালাম, কারণ তারা যুলম করত'। বস্তুতঃ যালিমরা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। দীন ও দুনিয়ার কোন কার্যক্রমেই সঠিক পথ পায় না। আলোচ্য আয়াতে বানূ ইসরাঈল যখন আল্লাহ তা'আলার কথাকে পরিবর্তন করে ব্যঙ্গাত্মক শব্দ ও ঠাট্টা-মশকারার মাধ্যমে তাঁর বিধানের বিরোধীতা করেছিল। তখন তিনি তাদেরকে এই সীমালংঘন ও যুলমের কারণে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেন যে, তাদের প্রতি আকাশ থেকে শাস্তি পাঠানো হয়েছে। এই 'শাস্তি' কি ছিল সে সম্পর্কে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ তাদের প্রতি হুঁসিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। করুণাময় আল্লাহ বলেন,

{فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيْمٍ}

'অতএব যালিমদের জন্য ধ্বংস যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির', [আয্ যুখরুফ- ৪৩:৬৫]। তাদেরকে করুণ পরিণতির হুমকি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ}

'আর যালিমরা অচিরেই জানবে, কোন ধরনের গন্তব্যস্থলে তারা ফিরে যাবে' [আশ্-শু'আরা- ২৬:২২৭]। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমাত থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

{فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ}

'অতঃপর সত্যি সত্যি তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল, ফলে আমরা তাদেরকে ভাসমান আবর্জনার মত করে দিলাম। কাজেই যালিম সম্প্রদায়ের জন্য রইলো ধ্বংস' [আল মু'মিনুন- ২৩:৪১]।

যুলমের প্রকার: যুলমের অনেক ধরন ও প্রকার রয়েছে, যেমন:

(ক) মানুষকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, শিথিলতা দেখানো এবং তাদের ক্ষতি সাধন করা। এর সবচেয়ে জঘন্য রূপ হচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্রে অন্যায়, অবিচার এবং নিপীড়ন করা আর মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান, বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে চড়াও হওয়া

এবং নানা প্রকারের সীমালঙ্ঘনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা। এটাই হচ্ছে, মানবতার প্রতি অপরাধ।

(খ) মানুষের প্রতি যুলমের আরেকটি প্রক্রিয়া হচ্ছে, মানুষের ধর্মীয় ক্ষেত্রে যুলম করা। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কামনা ও সংশয় সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে সত্য দীন থেকে ফিরে রাখা। এসব মন্দ কাজ তাদেরকে শিরক, কুফরী ও বিদ'আতের মধ্যে ফেলে দেয়। একইভাবে দুরাচার, পাপাচার ও জঘন্য কার্যক্রমে নিমজ্জিত করে। যেসব মানুষ এ প্রকারের যুলম ধারণ করে তারা তাদের কামনা-বাসনা বিভিন্ন মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয় এবং তাদের যৌনতার কথাও তারা তাদের বই-পুস্তকের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটায়। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও চারিত্রিক স্খলন তাদের মাঝে এই পরিমাণ ছড়িয়ে যায় যে, তাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ শেষ হয়ে যায়। অপরদিকে যৌনতা, অশ্লীলতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি লাভ করে। মানুষের সমাজ তখন পশুর সমাজে বা তার চেয়ে জঘন্য সমাজে পরিণত হয়।

(গ) মানুষের প্রতি যুলম করার আরেকটি ধরন হচ্ছে, অন্যায়ভাবে হত্যা, গুম, খুন, জেল-জরিমানা, শাস্তি ও নির্যাতন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষদের জীবনের উপর চড়াও হওয়া। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লম বলেন,

إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ فِي الدُّنْيَا

'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেন, যারা দুনিয়াতে মানুষকে শাস্তি দেয়', [সাহীহ মুসলিম ৪/২০১৭, নং ২৬১৩]। আর যারাই মানুষের প্রতি যুলম করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা করে এবং মাযলুমদের দুরাবস্থা দেখে আনন্দ-উল্লাস করে, তারা প্রত্যেকেই অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত যালিমদের মধ্যে শামিল। মানুষের মান-সম্মানে আঘাত করাও তাদের প্রতি যুলম করা। সুতরাং সমাজে অশ্লীলতা ছড়ানো, সৎ ও সতী-সাধ্বী মুসলিম নর-নারীদের প্রতি অপবাদ দেয়া, মিথ্যা ছড়ানো ও কুৎসা রটানো ইত্যাদি যুলমের একেকটি ধরন। আবার যারা অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও অবাধ যৌনতা ছড়ানোর পথগুলোকে উন্মুক্ত করে ও বাজারজাত করে, সেগুলোও যুলমের অন্তর্ভুক্ত; যেমন: অশ্লীল ছায়াছবি, উগ্র ও যৌন উদ্রেককারী পোশাকাদি, কামোদ্দীপক সাজ-সজ্জা, ম্যাগাজিন ইত্যাদির ব্যবসা-বানিজ্য করা। তাছাড়াও গীবত, নিন্দা-চর্চা, খারাপ নামে ডাকা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে অপকর্ম দ্বারা সত্যপন্থী, 'আলিম-'উলামা ও দা'য়ীগণের মান-সম্মানের উপর চড়াও হওয়াও জঘন্য যুলম।

(ঘ) মানুষের ধন-সম্পদ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধ্বংস, দখল, বা কৌশল ও প্রতারণা ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা যুলমের আরেকটি প্রকার।

(ঙ) সবচেয়ে বড় ও কঠিন 'যুলম' হচ্ছে, যালিম সরকার কর্তৃক জনসাধারণ ও নাগরিকদের উপর চরম অত্যাচার ও নির্যাতন পরিচালনা করা। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আধিপত্য ও ফ্যাসিবাদ কায়েম করা। যেমন ফির'আউন তার জাতির উপর স্বৈরচার

হয়ে চেপে বসেছিল। বিশেষ করে যাদেরকে তাদের প্রতিপক্ষ মনে করে, তাদের উপর যুলম নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাত। ক্ষমতার আধিপত্য কায়েম করে অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও চরম নিষ্ঠুরতার চর্চা করত। হত্যা ও রক্তপাত করত, জীবিত মানুষের উপর সীমাহীন নির্যাতন চালাত, গর্ভবতী নারীদের পেট চিরে বাচ্চাদেরকে বের করে ফেলে দিত। মানুষের চোখ এবং শিশুদের নখ উপড়ে ফেলত। বাড়ি-ঘর ধ্বংস করত, অবরোধ করত, অনাহারে রাখত, খাদ্যে বিষ মিশিয়ে হত্যা করত, অপমান -অপদস্থ করত, সম্পদ ছিনিয়ে নিত। এভাবে তারা মানুষদেরকে পরিপূর্ণ দাস বানিয়ে রাখত। ফির'আউনের অত্যাচারের নির্মমতা তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ}

'সে বলল, অচিরেই আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব। আর নিশ্চয় আমরা তাদের উপর শক্তিধর', [আল আ'রাফ- ৭:১২৭]। অর্থাৎ তাদেরকে পুরুষশূন্য করে নারীদেরকে দাসী করে রাখবে। নারীরা আমাদের ক্ষমতা ও শাসন থেকে বাইরে যেতে পারবে না। এটা ছিল ফির'আউনের চরম ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতা, স্বেচ্ছাচারীতা ও অহংকার। এ জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ}

'নিশ্চয় ফির'আউন যমীনের উপর অহংকারী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে দুর্বল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী', [আল কাসাস- ২৮:৪]। অর্থাৎ তার সমর্থক ও কর্মীদেরকে বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিত এবং অন্যদেরকে শত্রু ভেবে অধীন করে পদানত করে রাখত। তাদেরকে পর্যদুস্ত, নিষ্পেষিত করত। রাতদিন তাদের দ্বারা রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের কঠোর পরিশ্রম করাত', [তাফসীর ইবন কাসীর ৬/২২০, ফাতহুল কাদীর ৪/১৮৭]। এভাবে তাদের বাড়ি-ঘর অবরোধ করত, পাকড়াও করত, গুম করা হত, গোপন কারাগারে রাখা হতো এবং নানা প্রকারের অত্যাচার পরিচালনা করত।

যুগে যুগে যালিমদের পরিণতি: মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর সাধারণ নীতি হচ্ছে, তিনি বিলম্বে হলেও অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীকে পাকড়াও করেন। সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে, তিনি যালিমকে ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। যালিমের শেষ পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। আল-কুরআনে যালিমদের পরিণতির ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। যালিমদের শাস্তি দিতে আল্লাহর কোন পরওয়া নেই। তিনি তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে চরমভাবে অপদস্থ করেন। যুলম-নির্যাতনের বিভৎসতা ও এর বহুমুখী ক্ষতির বিবেচনায় পরকালের শাস্তির আগেই মহান আল্লাহ দুনিয়ার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

‘যুলম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার চেয়ে এমন কোন গুনাহ নেই, যা গুনাহগার ব্যক্তিকে পরকালে তার জন্য যে শাস্তি রয়েছে তা জমা রেখে দুনিয়াতেই দ্রুত শাস্তি প্রদানের জন্য অধিক উপযোগী’, [সুনানুত তিরমিযী ৪/২৪৫, নং ২৫৫, সুনান আবি দাউদ ৪/২৭৬, নং ৪৯০২, হাদীসটি সাহীহ]।

মহান আল্লাহর স্থায়ী নীতি হচ্ছে যালিমদেরকে ধ্বংস করা, সীমালংঘনকারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে মানব সমাজ থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা। সবচেয়ে বড় ও স্বেচ্ছাচার যালিমগণ, যারা দুনিয়াতেই শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে তাদের অন্যতম হচ্ছে ফির‘আউন। আল্লাহ তা‘আলা যাকে সকল স্বৈরাচারের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

তার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى}

‘অতঃপর আল্লাহ তাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন’, [আন্ নাযি‘আত- ৭৯:২৫]। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُوْدَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيْنَ}

‘অতঃপর আমরা তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। সুতরাং দেখুন, যালিমদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল’, [আল কাসাস- ২৮:৪০]। অর্থাৎ আল্লাহ তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন, যা দেখে অন্যান্য বিদ্রোহী ও দাম্ভিকরাও আতঙ্কিত হয়ে যায় এবং শিক্ষা পায়, [তাফসীর ইবন কাসীর ৮/৩১৫, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৫৫, আদওয়াউল বায়ান ৮/৪২০]।

দাম্ভিক ও অহংকারী আরেক যালিম হচ্ছে কারূন, যে তার সম্প্রদায় ও মূসা (‘আ) এর প্রতি সীমালংঘনমূলক আচরণ করেছিল। আল্লাহ তাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দিয়েছিলেন। কিন্তু সে অত্যাচারী হয়ে উঠে। অতঃপর আল্লাহ তাকে কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ}

‘অতঃপর আমরা কারূনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার সপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না’, [আল কাসাস- ২৯:৮১]।

আর যালিমদের জন্য পরকালের যে শাস্তি তা তো আরো ভয়াবহ আরো কঠিন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقٍ}

'তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর! আর আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার মত তাদের কেউ নেই', [আর রা'দ- ১৩:৩৪]।

অতীতের যালিম দেশ ও জাতির সাথে আল্লাহর আচরণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِيْنَ}

'আর আমরা বহু জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাদের পরে অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি', [আল আম্বিয়া- ২১:১১]। আল্লাহ সুবহানাহু আরও বলেন,

{وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا}

'আর ঐসব জনপদ তাদের অধিবাসীদেরকে আমরা ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা যুলম করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমরা নির্দিষ্ট সময় স্থির করেছিলাম', [আল কাহফ- ১৮:৫৯]। এসব আয়াতে 'আদ, সামূদ ও অন্যান্য যালিম জাতির কথা বলা হয়েছে। অতীতের এ জাতিগুলো অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। তা সত্ত্বেও তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। সুতরাং হে উম্মাতে মুহাম্মাদী, সে তুলনায় তোমরা কিছুই না। তাই সাবধান! আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيْرُ}

'আর আমি বহু জনপদকে অবকাশ দিয়েছি, যখন তারা যালিম ছিল; তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি, আর আমারই কাছে প্রত্যাবর্তনস্থল', [আল হাজ্জ- ২২:৪৮]।

আল্লাহর শাস্তির প্রকার ও ধরন: আল্লাহ তা'আলা ও যালিম ও কাফিরদেরকে নানা প্রকারের শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ}

'সুতরাং তাদের প্রত্যেককেই আমরা তার অপরাধের জন্য পাকড়াও করেছিলাম। তাদের কারো উপর আমরা পাথরকুচিসম্পন্ন প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠিয়েছিলাম, তাদের কাউকে আঘাত করেছিল বিকট ধ্বনি, কাউকে আমরা ভূগর্ভে প্রোথিত করেছিলাম এবং কাউকে আমরা (সাগরে) নিমজ্জিত করেছিলাম। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি যুলম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলম করছিল', [আল-'আনকাবূত-২৯: ৪০]।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যালিমদের শাস্তি ও শেষ পরিণতি উল্লেখ করার পর বলেন,

{فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}

'ফলে যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো এবং সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্যই', [আল আন'আম- ৬:৪৫]। এ আয়াতে এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

অপরাধী ও অত্যাচারীদের উপর শাস্তি নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্য একটি নি'য়ামাত। এজন্যে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ তিনি তাঁর বন্ধুদের সাহায্য করেছেন এবং তাঁর শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, [কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর ১/৬৪৪]।

শিক্ষাসমূহ: আলোচ্য আয়াত ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। নিম্নে কতিপয় শিক্ষা তুলে ধরা হলো;

এক. আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের সীমারেখা অতিক্রম করা ও ন্যায় ভ্রষ্টতাই হচ্ছে 'যুলম'। তাই সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলা সকলের জন্য অপরিহার্য।

দুই. অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ, অধিকার নষ্ট, বৈষম্য সৃষ্টি ও অসদাচারণসহ সব ধরনের অপকর্ম, এবং অশ্লীলতা যুলমের অন্তর্ভুক্ত। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাকা সকল মানুষের কর্তব্য।

তিন. আল্লাহ প্রদত্ত বিধান দিয়ে যারা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন/পরিচালনা করে না তারা হয় কাফির, বা ফাসিক বা যালিম কিংবা সবই। সুতরাং সকল মানুষের এ মৌলিক বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত, বিশেষ করে মুসলিম জনশক্তির।

চার. 'যুলম' একটি সর্বাত্মক ধ্বংস ও বহুমুখী ক্ষতির কারণ এবং তা মানবতার প্রতি অপরাধ। তাই এই চরম অপকর্ম ও অন্যায় থেকে প্রতিটি মানুষেরই বেঁচে থাকা উচিত।

পাঁচ. 'যুলম' একটি বিশাল অন্যায় কাজ, আর সবচেয়ে বড় অন্যায় হচ্ছে, আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা। তাই সর্বপ্রকার যুলমের শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। যালিমকে আল্লাহ দুনিয়াতে ত্বড়িত ও অপমানজনক শাস্তি দেন এবং আখিরাতেও এর চরম শাস্তি রয়েছে, তা স্মরণ রাখা প্রত্যেকের উচিত।

ছয়. ন্যায়-ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দুরীকরণ, অন্যের সর্বপ্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই যুলমের বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিরোধ। তাই সকলকে যুলমের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত, সামষ্টিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলা অপরিহার্য।

করুণাময় আল্লাহ আমাদেরকে এ শিক্ষাগুলো বাস্তবজীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

সালমা মাওলাতু রাসূলিল্লাহ (সা)

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

সালমা (রা) এমন একজন মহিলা সাহাবী যিনি মাক্কায় ইসলামের সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নাবীগৃহে থাকতেন এবং তাঁর খিদমাত করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। ফলে তিনি একজন সুউচ্চ সম্মানের অধিকারিনী মহিলা সাহবীদের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি হলেন, নাবী (সা) এর সেবিকা উম্মু রাফি সালমা (রা)। নাবী (সা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ রাফি'-এর স্ত্রী এবং তাঁর সন্তানের গর্ভধারিনী। মূলত: নাবী (সা) যে সব দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। সালমা (রা) বলেন : আমি, খাদিরা, রিদওয়া ও মায়মূনা বিনত সা'দ-সবাই রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করতাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন।[১]

সালমা ও আসদুল্লাহ হামযা (রা)

বিভিন্ন বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, সালমা (রা) ছিলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু সাফিয়্যা বিনত 'আবদিল মুত্তালিব এর দাসী। এক পর্যায়ে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে চলে আসেন। মাক্কায় ইসলামের সূচনাপর্বে যে সকল মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন, সালমা (রা) ছিলেন তাঁদের একজন। মাক্কায় নাবী মুহম্মাদ (সা) ও মুসলিমদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, তার কিছু সালমা (রা) প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন, একদিন তিনি দেখেন, আবূ জাহল নাবী (সা)কে কষ্ট ও গালি দিচ্ছে এবং তাঁর সাথে খুবই অমানবিক আচরণ করছে। এর কিছুক্ষণ পরেই হামযা ইবন 'আবদিল মুত্তালিব শিকার থেকে ফেরার পথে সেখানে পৌঁছেন। সালমা (রা) তাঁকে দেখে তাঁর কাছে যান এবং কিছুক্ষণ আগে তিনি যে দৃশ্য দেখেছেন, তা তাঁকে অবহিত করেন। হামযা (রা) খুবই রেগে গেলেন। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন : তুমি যা বললে, তাকি তুমি স্বচক্ষে দেখেছো? সালাম (রা) বললেন : হ্যাঁ।

হামযা (রা) আবূ জাহলের তালাশে চলে গেলেন। তাকে তার সমচিন্তার অধিকারীদের সাথে বসা অবস্থায় পেলেন। তিনি আবূ জাহলের নিকটে গিয়ে তার মাথায় নিজের ঢাল দিয়ে এতো জোরে আঘাত করেন যে, মাথা ফেঁটে যায়। তারপর তিনি আবূ জাহলকে বলেন : তুমি তাঁকে (মুহাম্মাদ) গালাগালি করো? এখন আমি তাঁর দিনের ওপর। তিনি যা বলেন, আমিও তাই বলি। যদি শক্তি ও সাহস থাকে তাহলে তাঁর সাথে যেমন আচরণ করেছো, আমার সাথেও তেমন করো।[২]

---

১. নিসাউ মিন 'আসরি নুবুওয়াতি-৪২৮

২. আল ইসাবা-৪/৩২৬; আস-সীরাতু আল-হালাবিয়্যাহ-১/৪৭৭

আবূ জাহল দুঃখ ও অনুশোচনা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু বলতে পারলো না। উল্লেখ্য যে, হামযা কিন্তু তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। এই ঘটনার পর তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। হামযা (রা) এর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দানের পর মাক্কায় ইসলাম শক্তিশালী হয় এবং মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে হামযা (রা) হয়ে যান 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ)। আর পশ্চাতে যিনি বড়ো ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি হলেন সালামা (রা)।

সালমা (রা) নাবী (সা) পরিবারের বিভিন্ন কাজের সাথে সব সময় জড়িত থেকেছেন। নাবী (সা) তাঁর সততা ও নিষ্ঠার জন্য তাঁকে অনেকটা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে ফাতিমা (রা) এর সাথেও যুক্ত হন। তিনি তাঁকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেছেন।

সালমা (রা) নারীদের ব্যক্তিগত বিষয়ে বেশ দক্ষ ছিলেন। বিশেষত: সন্তান প্রসবকালীন সময়ে করণীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এর ছেলে ইবরাহীমের মা ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন সারিয়াহ (রা)। সালমা (রা) তাঁর দেখাশুনা করতেন। সন্তান প্রসবের সময় সালমা (রা) পাশে ছিলেন। ছেলের জন্মের পর সালামা (রা) ঘর থেকে বেরিয়ে স্বামী আবূ রাফে'-কে খরবটি দেন। আবূ রাফে' (রা) খুব দ্রুত নাবী (সা)-এর নিকট গিয়ে এ সুখবরটি তাঁর কাছে পৌঁছে দেন। তিনি এ সুখবর শুনে তাঁকে একটি দাস দান করেন। ছেলের জন্মের সপ্তম দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তার নাম রাখেন ইবরাহীম।

এভাবে সালমা (রা) নাবী (সা) পরিবারের বিভিন্ন কাজের সাথে সব সময় জড়িত থেকেছেন। নাবী (সা) তাঁর সততা ও নিষ্ঠার জন্য তাঁকে অনেকটা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে ফাতিমা (রা) এর সাথেও যুক্ত হন।[৩] তিনি তাঁকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেছেন। সালমা (রা) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের সেবার ব্যাপারে বেশ দক্ষ ছিলেন। ফাতিমা (রা) তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে, তিনি দেখাশুনা করেছেন। ফাতিমা (রা)-এর মৃত্যুর পর সালমা (রা) তাঁকে গোসল দেন।[৪]

উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিনত জাহাশ (রা)-এর সংগে রাসূলুল্লাহর (সা) যে বিয়েটি হয়, তা ছিলো মূলত: আসমানী বিয়ে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁদের এ বিয়েটি

৩. আত-তাবাকত-৮/২২৭; তাহযীবুল আসমা ওয়াল লূগাত-২/৩৪৭
৪. নিসাউ মিন'আসরি নুবুওয়াতি-৪২৯

দিয়ে দেন। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন বলেন : 'কে যয়নাবের কাছে গিয়ে তাকে এ সুখবরটি পৌঁছে দেবে যে, আল্লাহ আসমান থেকে তার সাথে আমার বিয়ে দিয়েছেন?'

সালমা (রা) বেরিয়ে পড়েন এবং যয়নাব (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে এ সুখবরটি পৌঁছে দেন। যয়নাব (রা) তাঁকে কিছু উপহারও দেন।

সালমা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে বিভিন্ন যুদ্ধেও গিয়েছেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, তিনি খায়বার যুদ্ধে গিয়েছিলেন। ইবন কাছীর (রহ) বলেছেন : তিনি হুনায়ন-এর ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন।[৫]

সালমা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য সুস্বাদু খাবার তৈরি করতেন। তিনি খুবই পসন্দ করতেন। মুতার যুদ্ধে জা'ফর ইবন আবী তালিব (রা) শাহাদাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে তাঁর পরিবারের জন্য সালমা (রা) খাবার তৈরি করেন। জা'ফর (রা)-এর ছেলে 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমি ও আমার ভাই রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে সেই খাবার খাই। সে খাবার ছিলো অীত চমৎকার ও বরকতময়।

সালমা (রা) বলেন : একদিন হাসান ইবন 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) আমার কাছে এসে বলেন : আপনি আমাদের জন্য এমন কিছু খাবার তৈরী করুন যা নাবী (সা) পসন্দ করেন। তিনি তাঁর পদ্ধতিতে খাবার তৈরি করে তাঁদের সামনে দিয়ে বলেন : নাবী (সা) এরূপ খাবার পসন্দ করেন।[৬]

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এই ভাগ্যবতী মহিলার বিশেষ স্থান ও মর্যাদা ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সুবিধা-অসুবিধার কথা জানতে চাইতেন। কোনো অসুবিধা থাকলে তা দূর করে দিতেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) বলেন : আবূ রাফি'-এর স্ত্রী সালমা একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, সে তাকে মারধর করার হুমকি দেয়। রাসূল (সা) আবূ রাফি'র কাছে জানতে চান, এরূপ করার কারণ কি? আবূ রাফি' বলেন : সে আমাকে কষ্ট দেয়। রাসূল (সা) বলেন : সালমা! তুমি কিসের সাহায্যে তাকে কষ্ট দাও? সালমা বলেন : কোনো কিছুর সাহায্যে আমি তাকে কষ্ট দেই না। তবে একদিন সে সালাত আদায়রত অবস্থায় ছিলো। এ সময় তার পেট থেকে বায়ু নির্গত হয়ে তার ওযু চলে যায়। তখন আমি তাকে বলি : আবূ রাফি'! রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের কারো পেট থেকে বায়ু নির্গত হলে সে যেন ওযু করে নেয়। সালমা (রা)-এর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) একটু হেসে দেন। তারপর বলেন : 'আবু

---

৫. প্রাগুক্ত-৪৩০; আত-তাবাকাত-৮/২২৭

৬. হায়াতুস সাহাবা-২/৫০২; উসুদুল গাবা-৫/৪৭৮

রাফি‘! সে তো তোমাকে ভালো কথাই বলে।’[৭] ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করলে দেখা যায়, নাবী (সা) এর নিকট সালমা (রা)-এর বিশেষ মর্যাদা ছিলো। এখানে উল্লেখ্য যে, সালমা নামে ষোল (১৬) জন মহিলা সাহাবীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের একজন হলেন, আমাদের আলোচিত সালমা (রা)।

সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) ও ফাতিমা (রা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে তা বর্ণনা করেছেন তাঁর পৌত্র ‘উবায়দুল্লাহ ইবন ‘আলী ইবন আবী রাফি‘ (রা)।[৮]

ইবন হিব্বান (রহ) সালমা (রা)-এর বর্ণিত নিম্নের হাদীছটি উল্লেখ করেছেন :

রাসূল (সা) বিড়ালের ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : একজন মহিলাকে বিড়ালের ব্যাপারে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সে একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে খেতে দিতোনা, এদিক ওদিক থেকে কিছু খুঁটে খাবে, তার জন্য ছেড়েও দিতো না।[৯]

সালমা (রা) বর্ণিত আরেকটি হাদীছ হলো, একদিন তিনি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু কথা বলে দিন যা দ্বারা আমি সালাত শুরু করতে পারি। রাসূল (সা) বললেন : যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে তখন আস্তে করে ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে।[১০]

সালমা (রা) খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। তবে সঠিক সন-তারিখ জানা যায় না।

এখানে সালমা (রা) এর স্বামী আবূ রাফে‘ (রা) এর পরিচিতি মূলক অল্প কিছু কথা তুলে ধরা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন মিসরের কিবতী সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর আসল নাম ছিলো ইবরাহীম, মতান্তরে আসলাম। মাক্কায় তিনি ‘আব্বাস ইবন ‘আবদিল মুত্তালিবের দাস ছিলেন। তিনি তাঁকে দাস হিসেবে নাবী (সা) কে দান করেন। ফলে তিনি নাবী (সা) এর মালিকানায় চলে আসেন। নাবী (সা) যখন ‘আব্বাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনলেন, তখন তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। তিনি উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে মুসলিমদের সংগে যোগ দেন। তিনি একজন জ্ঞানী ও মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনেকগুলো হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ‘আলীর (রা) খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। ■

---

৭. আল ইসাবা-৪/৩২৬; উসুদুল গাবা-৫/৪৭৮
৮. তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪২৫; আল ইসতী‘আব-৪/৩২২
৯. আল ইসতী‘অব-৪/৩২২
১০. আল-ইসাবা-৪/৩২৬

মধ্যমপন্থা : ইসলামের অনন্য সৌন্দর্য

অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক

ভূমিকা

মহান আল্লাহ যুগে যুগে বিশ্বমানবতার প্রতি যেসব আসমানী বিধি-বিধান নাযিল করেন তা ছিলো সামগ্রিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বজনীন। কিন্তু বিশ্ববাসী যখনই আসমানী বিধি-বিধান বর্জন করে নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত রীতিনীতি গ্রহণ করেছে তখন এই ভারসাম্য তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে এবং বিশ্ববাসী এক অজানা ধ্বংসের কূপে ঝাঁপ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আসমানী বিধি-বিধান এবং ও মানুষের আচার-আচরণ ও কর্মের মাঝে ন্যায্যতা রক্ষাই হচ্ছে মধ্যমপন্থা এবং তা লঙ্ঘন করাই হচ্ছে চরমপন্থা বা বাড়াবাড়ি। আলোচ্য প্রবন্ধে মধ্যমপন্থার কল্যাণকারিতা এবং তা বর্জন করার ক্ষতির দিকগুলো আলোচনায় স্থান পাবে।

মধ্যমপন্থা কি

আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে 'মধ্যমপন্থা' সম্পর্কে জেনে নিই। 'মধ্যমপন্থা' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ 'আত-তাওয়াস্সুত' (التوسط)। এ ছাড়াও এর একাধিক পরিভাষা রয়েছে। যেমন, আত-তাওয়াযুন (التوازن) ও আল-ই'তিদাল (الاعتدال)। এই শব্দ দুটোও ভারসাম্য ও ন্যায্যতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা এখানে বোঝাতে চাচ্ছি, দুটো বিপরীতমুখী প্রান্তিকতার কোনো একটির দিকে ঝুঁকে না পড়ে ন্যায্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যাতে দুটোর কোনো একটি প্রান্ত তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি না পায় এবং অপর প্রান্তের ওপর কর্তৃত্ব খাটিয়ে যুলুম করতে না পারে।

কুরআন মাজীদে 'আল-ওয়াসাত' (الوسط) এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...

"এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী উম্মাতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন"।[১]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ.

"তাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তি বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, তোমরা এখনো আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছো না কেনো"?[২]

আত-তাওয়াস্সুত এর ব্যাখ্যায় ইমাম আল রাযী বলেছেন, "কোনো একটি বস্তুর

---

১. সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৪৩

২. সূরা আল-কালাম, ৬৮ : ২৮

সবচেয়ে উপযুক্ত অংশটি হলো তার মধ্যভাগ। কারণ কোনো বস্তুর মাঝখানের অংশটি সব পাশ থেকেই সমান ও ভারসাম্যপূর্ণ"।[৩]

আমরা অপনাদেরকে প্রান্তিকতার কতিপয় নমুনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। যেমন, আল্লাহর হক বনাম বান্দার হক, আধ্যাত্মিকতা বনাম জাগতিকতা, দুনিয়া বনাম আখিরাত, ওয়াহী বনাম 'আকল ইত্যাদি। আশা করি উপরোক্ত আলোচনা থেকে আত-তাওয়াস্সুত-এর অর্থ স্পষ্ট হয়েছে।

আত-তাওয়াস্সুত-এর বিপরীতে দুটো শব্দ পাওয়া যায়। যেমন, আল-গুলু (الغلو)। এর অর্থ-বাড়াবাড়ি এবং আলইনহিলাল (الانحلال)। এর অর্থ-হারামকে হালাল সাব্যস্ত করা। প্রথমে আমরা আলগুলু (الغلو) সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই।

আল-গুলু (الغلو) শব্দের অর্থ বাড়াবাড়ি, কঠোরতা-আরোপ ইত্যাদি। এই বাড়াবাড়ি ইসলামী শরী'আতে সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ...

"হে আহলে কিতাবগণ! দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না এবং আল্লাহ সম্পর্কে নিরেট সত্য ছাড়া ভিন্ন কিছু বলবে না "...।[৪]

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ .

"বলো, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দীন সম্পর্কে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করবে না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না"।[৫]

এবিষয়ে হাদীসেও নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ « الْقُطْ لِى حَصًى ». فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِى كَفِّهِ وَيَقُولُ « أَمْثَالَ هَؤُلاَءِ فَارْمُوا.ثُمَّ قَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِى الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِى الدِّينِ.

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জামরাতুল 'আকাবার ভোরে তাঁর উটের ওপর আরোহিত অবস্থায় বলেছেন, "আমার জন্য কংকর সংগ্রহ করো। আমি তাঁর জন্য সাতটি কংকর সংগ্রহ করলাম। সেগুলো ছিলো আকারে ছোট।

---

৩. ইমাম আল-রাযী, তাফসীর আল-রাযী, মিসর : আল-মাকতাবা আল-মিসরিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ১০৮-১০৯, ১৯৩৫

৪. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৭৭

৫. সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ৭৭

তিনি সেগুলো তাঁর হাতের তালুতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন, এ ধরনের ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করবে। তিনি আরো বলেন, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকবে। কেননা তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে দীনের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি ধ্বংস করেছে"।[৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضى الله عنه – قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ « مَا هَذَا الْحَبْلُ » . قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ . فَقَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – « لاَ ، حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, "নাবী (স) (মসজিদে) প্রবেশ করে দেখতে পান যে, দুটি খুঁটির মাঝখানে একটি লম্বা রশি টানানো রয়েছে। তখন তিনি বলেন, এ রশি কিসের জন্য? লোকজন বললো, এটি যয়নবের রশি। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে এটির সাথে নিজকে বেঁধে নেন। নাবী (স) বলেন, না; এটি খুলে ফেলো। তোমাদের মধ্যকার যে কেউ প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্যম বজায় থাকা পর্যন্ত যেনো সালাত আদায় করে এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে যেনো বসে যায়" (বিরত থাকে)।[৭]

.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رضى الله عنه – يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ « لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ »

ইবন 'উমর (রা) বলেন, আমি নাবী (সা)কে বলতে শুনেছি, "তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিস্টানরা ইবন মারইয়াম (আ)এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। কেননা আমি একমাত্র তাঁর (আল্লাহ) বান্দা। সুতরাং তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল"।[৮]

দ্বিতীয়ত আমরা আলোচনা করবো আল-ইনহিলাল (الانحلال) সম্পর্কে। আর তা হচ্ছে, 'হারামকে হালাল সাব্যস্ত করা'। এধরনের কাজ ইসলামে সামগ্রিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ .

"এবং তোমরা তোমাদের যবান থেকে মিথ্যা কথা বের হয় বলে তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করার জন্য একথা বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। যেসব লোক আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তারা কখনো সফলকাম হতে পারে না"।[৯]

---

৬. ইবন মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক, বাব: কাদরু হাসার রামি, নং ৩১৪৪
৭. বুখারী,কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাব: মা ইয়াকরাহু মিনাত-তাশদীদি ফিল-ইবাদাহ, নং ১১৫০
৮. বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, বাব : অযকুর ফিল-কিতাবি মারইয়াম..., নং ৩৪৪৫
৯. সূরা আন-নাহল, ১৬ : ১১৬

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ .

"বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তোমরা (কিসের ভিত্তিতে) তার কিছু হারাম করছো এবং কিছু হালাল করছো? বলো, আল্লাহ কি অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছো"?[১০]

মধ্যমপন্থার ক্ষেত্রসমূহ

ইসলাম সর্বজনীন জীবনাদর্শ। এই বিধানে সংকীর্ণতা নেই, নেই কঠোরতাও, বরং রয়েছে প্রশস্ততা ও সহজতা। এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ক্ষেত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো,

১. বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা

(ক) বিশ্বে এমন একদল লোক আছে, যারা আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কুসংস্কারপন্থী। তারা অকাট্য দলীল-প্রমাণ ছাড়াই সবকিছুকে অনুমানের ভিত্তিতে সত্য বলে বিশ্বাস করে। অপর একটি দল আছে এমন, যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী। যা দৃশ্যমান নয় তারা তাতে বিশ্বাস করে না। তবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান হলো উপরোক্ত দুটো দলের মাঝামাঝি, তারা মধ্যমপন্থী। তারা অকাট্য দলীল-প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করতে যেমন নারাজ, তদ্রূপ তারা দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয়াদি বর্জনের ক্ষেত্রেও নারাজ। কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে,

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

"বলো, তোমাদের প্রমাণ পেশ করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো"।[১১]

পক্ষান্তরে অনুমাননির্ভর বিষয় কোনোভাবে ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন-

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ...

"তাদের অনেকেই অনুমানেরই অনুসরণ করে, (অথচ) সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোনো কাজে আসে না"...।[১২]

(খ) একটি দল আছে এমন, যারা নাস্তিক এবং অপর একটি দল আছে, যারা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী (মুশরিক)। এদলটি পশু, মূর্তি ও পাথরের পূজা করে। এক্ষেত্রে ইসলাম আল্লাহর একত্বে অবিশ্বাস এবং একাধিক স্রষ্টায় বিশ্বাস-এই দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝিতে অবস্থান করে। একারণে ইসলাম মানবজাতিকে এক স্রষ্টায় বিশ্বাসের দিকে আহ্বান জানায়, যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং যাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর পরিচয় বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে। যেমন-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ.

---

১০. সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৯
১১. সূরা আল-বাকারা, ২ : ১১১
১২. সূরা ইউনুস, ১০ : ৩৬

"সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামতের দিন পর্যন্তও সাড়া দিবে না? এবং তারা তাদের প্রার্থনা সম্পর্কেও অবহিত নয়"।[১৩]

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

"বলো, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্মও দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই"।[১৪]

(গ) ইসলাম হচ্ছে সেই দুটো দলের মাঝামাঝি, যাদের একটি দল মানুষকে ইলাহ সাব্যস্ত করে নিয়েছে এবং অপর দলটি মানুষকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শেকলে বন্দী মনে করে। এদলটির মতে, মানুষ অনেকটা পুতুলের ন্যায়। তার কোনো কর্মক্ষমতা নেই। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ কোনো কিছুর নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক নয় ঠিকই, কিন্তু তার নিজস্ব গণ্ডিতে কর্মতৎপরতা পরিচালনার সক্ষমতা রয়েছে। যেমন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

"এবং আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা পরিবর্তন করেন"...।[১৫]

(ঘ) ইসলামের অবস্থান হচ্ছে সেই দুটি দলের মাঝামাঝি, যাদের একদল নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আল্লাহর আসনে বসিয়েছে অথবা তাঁদেরকে আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করেছে। আর অপর দলটি তাঁদের আনুগত্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং তাঁদেরকে তাদের ন্যায় নিছক মানুষ বলে বিশ্বাস করে। মহান আল্লাহ বলেন,

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

"তাদের রাসূলগণ তাদের বলতো, সত্য বটে, আমরা তোমাদের মতো মানুষই কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। আর আল্লাহর ওপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত"।[১৬]

২. 'ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা

ইসলাম 'ইবাদত এবং আনুষ্ঠানিক আচারের ক্ষেত্রে সেসব প্রান্তিক ধর্ম ও দলগুলোর

---

১৩. সূরা আল-আহ্কাফ, ৪৬ : ৫
১৪. সূরা আল-ইখলাস, ১১২ : ১-৪
১৫. সূরা আর-রা'দ, ১৩ : ১১
১৬. সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১১

মাঝামাঝি, যেসব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কোনো কোনোটি দর্শন ও দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিষয় যেমন, 'ইবাদত, ধার্মিকতা ও প্রভু ভক্তিকে সামগ্রিকভাবে বাদ দিয়েছে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলা যায়। এ ধর্ম মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে স্রেফ নৈতিক ও মানবিক অংশে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। আবার এমন দলও আছে, যারা তাদের অনুসারীদের কাছে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে 'ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ সন্ন্যাসবাদের কথা বলা যায়।

অপরদিকে ইসলাম মানুষকে যেমন আনুষ্ঠানিক 'ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানায় তদ্রূপ সালাত শেষে পুনরায় কাজকর্মে সম্পৃক্ত হতে আহ্বান জানায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি করো। সালাত শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও"।[১৭]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

"তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ (রিয্ক) সন্ধান করাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই"...।[১৮]

মোটকথা একজন মুসলিম তার ওপর অর্পিত 'ইবাদাত শেষে আয়-রোজগারে মনোযোগী হওয়ায় দোষের কিছু নেই, বরং তা 'ইবাদত। দীন ও জীবনের সাথে একজন মুসলিমের সম্পর্ক মূলত এধরনেরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এতেই নিহিত রয়েছে ইসলামের অপরূপ সৌন্দর্য।

৩. নৈতিকতার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা

(ক) মানবসমাজের দুটি দল। একটি দল অতি বিশুদ্ধবাদী। তারা মানুষকে ফেরেশতার ন্যায় মনে করে। এর ফলে তারা মানুষের জন্য এমন সব নৈতিক মূল্যবোধ ও শিষ্টাচার আরোপ করতে চায়, যা মানুষের পক্ষে পরিপালন করা সম্ভব নয়। অপর দলটি হচ্ছে এমন যে, তারা মানুষকে পশুর কাতারে দাঁড় করাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এর ফলে

---

১৭. সূরা আল-জুমু'আ, ৬২ : ৯-১০

১৮. সূরা আল-বাকবারা, ২ : ১৯৮

তারা মানুষের সাথে এমন আচার-আচরণ আরোপ করতে চায়, যা কোনোভাবে মানুষের সাথে মানানসই নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান উপরোক্ত দুটি দলের মাঝামাঝি। যেমন মানুষ হচ্ছে যৌগিক সৃষ্টি। তাদের যেমন বোধ-বুদ্ধি আছে, তদ্রূপ আছে প্রবৃত্তিও। মানুষের যেমন পাশবিকতা আছে, তেমন আছে মানবিকতাও। এককথায় মানুষের মাঝে দ্বিবিধ যোগ্যতা আছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

"অতঃপর তিনি তাকে তার অসৎকাজ ও তার সৎকাজের জ্ঞান দান করেন। সে-ই হবে সফলকাম, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষিত করবে"।[১৯]

(খ) দুটি দল। তাদের একটি দল আখিরাতকে পুরোপুরি অস্বীকার করে এবং দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে। তাদের প্রসঙ্গে কুরআন বলেছে-

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ .

"এবং তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না"।[২০]

অপর একটি দল আছে। তারা দুনিয়ার জীবনকে খারাপ হিসেবে বিবেচনা করে। তারা দুনিয়ার জীবনের বৈধ বিষয়াদিকেও নিজেদের জন্য নিষিদ্ধ মনে করে।

কিন্তু ইসলাম এই দুই ধরনের জীবনকেই বিবেচনায় রাখে। তারা দুনিয়া ও অখিরাত উভয় জীবনের মাঝে সমন্বয় খোঁজে। তারা দুনিয়াকে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র মনে করে। তারা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে, আনন্দ-আহ্লাদে যেমন নিজেদের ভাসিয়ে দেয় না, তদ্রূপ দুনিয়া-বিরাগী বৈরাগীও সাজে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ .

"কিন্তু যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় উদর পূর্তি করে। আর জাহান্নামই তাদের আবাস"।[২১]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ . قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ...

"হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও পবিত্র

---

১৯. সূরা আশ-শাম্‌স, ৯১ : ৮-১০
২০. সূরা আল-আন'আম, ৬ : ২৯
২১. সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১২

রিয্ক সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে"...?[২২]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো"।[২৩]

মধ্যমপন্থার বৈশিষ্ট্য

কোনো ব্যক্তি যদি দাবি করে যে, আমি মধ্যমপন্থা অনুসরণ করছি, তার এই দাবি হবে একান্তভাবে অগ্রহণযোগ্য, যদি না সে ভালোভাবে তা অনুধাবন করতে পারে। যে ব্যক্তি সত্যিকারার্থে মধ্যমপন্থা অনুসরণ করতে আগ্রহী, তা বোঝার জন্য তাকে মধ্যমপন্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর তা জানা থাকলেই কেবল সে সঠিক পথের সন্ধান পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

"যে ব্যক্তি (নিচের দিকে) ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই ঠিক পথে চলে, না সেই ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে"?[২৪]

উল্লেখ্য, মধ্যমপন্থাকে সামগ্রিকভাবে ধারণ করতে হবে, খণ্ডিতভাবে নয়। নিম্নে মধ্যমপন্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো:

১. ইসলামকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, ইসলাম সর্ববিধ খণ্ডিতরূপকে নাকচ করে দেয়। খণ্ডিতরূপ হলো, এমন 'ইবাদত বিহীন নৈতিকতা, শরী'আবিহীন আকীদা, জিহাদবিহীন শান্তি, ক্ষমতাহীন অধিকার, রাষ্ট্রবিহীন দীন ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহর বাণী,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ...

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী তুমি তাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করো, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকো, আল্লাহ তোমার ওপর যা নাযিল করেছেন তারা তার কিছু থেকে যেনো তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে"...।[২৫]

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

---

২২. সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৩২-৩৩
২৩. সূরা আল-বাকারা, ২ : ২০১
২৪. সূরা আল-মুলক, ৬৭ : ২২
২৫. সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ৪৯

"...তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশে অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ করবে তাদের প্রতিদান এই যে, তারা পার্থিব জীবনে লাঞ্ছিত হবে এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে ভয়ংকর শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন নন"।[২৬]

২. কুরআন-সুন্নাহকে তথ্যের মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ

আইন-বিধান প্রণয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহকে মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মহানাবী (সা)এর একটি হাদীস অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যেমন,

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم– قَالَ « تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

মালিক (র)এর নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা সেদুটো যতক্ষণ ধরে রাখবে পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ"।[২৭]

৩. ইসলামী শরী'আর আলোকে করণীয় নির্ধারণ

কুরআন-সুন্নাহ যেভাবে বলেছে, ঠিক সেভাবে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে, অন্যভাবে নয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

"হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাদের সাওয়াবের সমজ্ঞান করো, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট তারা সমান নয়। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না"।[২৮]

অতএব কোনো ছোট বিষয়কে বড়ো এবং কোনো বড়ো বিষয়কে ছোট করে দেখা সমীচীন নয়। বরং যে কাজ যে মানের, সেই মান বজায় রেখে এবং যেভাবে করা বাঞ্ছনীয় ঠিক সেভাবে সম্পাদন করাই মধ্যপন্থা।

৪. উপযুক্ত ব্যক্তির ইজতিহাদ

গণমানুষের একান্ত প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে ইজতিহাদ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ হলেন কেবল তারা, যাদের মাঝে ইজতিহাদ করার সক্ষমতা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে তাদের অবস্থান নাকচ করতে হবে, যারা ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করতে চান এবং যারা অন্ধ অনুকরণকে বাধ্যতামূলক মনে করেন। এছাড়া

---

২৬. সূরা আল-বাকারা, ২ : ৮৫

২৭. মুওয়াত্তা মালিক, কিতাবুল কাদ্‌র, বাব : আন-নাহী আনিল কাওলি বিল-কাদ্‌র, নং ১৬২৮

২৮. সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১৯

তাদেরও বর্জন করতে হবে, যারা যেকোনো ব্যক্তির জন্য ইজতিহাদ করার জন্য দরজা সর্বদা উন্মুক্ত রাখার পক্ষপাতি।

৫. ফাতওয়ার ব্যাপারে সহজীকরণ পদ্ধতির অনুসরণ

ফিক্হ ও ফাতওয়ার ক্ষেত্রে সহজতা অবলম্বন করতে হবে। এর মানে তা হবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে, অন্য কোনোভাবে নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ, তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক তা চান না"...।[২৯]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি"...।[৩০]

এবিষয়ে হাদীসেও নির্দেশনা রয়েছে,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا » .

আনাস (রা) সূত্রে নাবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা সহজতা অবলম্বন করো, কঠিন করো না এবং সুসংবাদ দাও, ঘৃণার উদ্রেক করো না"।[৩১]

৬. প্রজ্ঞাপূর্ণ ধারাবাহিকতার চর্চা

দাওয়াহ, প্রশিক্ষণ, ফাতওয়া প্রদান ও ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ ধারাবাহিকতা চর্চা করতে হবে, কোনোভাবে তাড়াহুড়া করা যাবে না। তাড়াহুড়ায় কখনো কখনো লাভের চেয়ে ক্ষতির আশংকা থেকে যায়। মহান আল্লাহর বাণী-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ .

"অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর তুমি তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন মনে হবে, তারা যেনো দিনের এক দণ্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এতো এটি ঘোষণা, পাপচারী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হবে"।[৩২]

উল্লেখ্য, মহানবী (সা)কে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সুদীর্ঘ তেইশ বছর সময় নিতে হয়েছে। সুতরাং তাড়াহুড়া নয়, বরং আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সাথে পথ চলতে হবে।

---

২৯. সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৫

৩০. সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৭৮

৩১. বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাব কাওলুন-নাবিয়ি স. রুব্বা মুবাল্লিগিন আওয়া মিন সামিঈন, নং ৬৯

৩২. সূরা আল-আহ্কাফ, ৪৬ : ৩৫

৭. শান্তি ও জিহাদ

শান্তির জন্য যারা হাত বাড়িয়ে দেয় তাদেরকে শান্তির দিকে আহ্বান করতে হবে। বিবদমান গোষ্ঠীর মাঝে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তবে স্বৈরশাসন অবসানের লক্ষ্যে জিহাদের আবশ্যকতা এবং দীন ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে শক্তিশালী সামরিক প্রস্তুতি মাথায় রাখতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ...

"তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে"...।[৩৩]

৮. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ

হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিউপাসকসহ সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। বিশেষত তাদেরকে পূর্ণ বাক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে। তাদের সাথে সদাচরণ করতে ইসলাম নিষেধ করে না, যতক্ষণে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিবে। মহান আল্লাহ বলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা যালিম"।[৩৪]

৯. নারীদের প্রতি ইনসাফ ও সম্মান প্রদর্শন

মানুষ হিসেবে, মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, কন্যা হিসেবে ও বোন হিসেবে একজন নারীকে ইসলাম যে অধিকার দিয়েছে, তা আদায়ে শক্ত অবস্থান নিতে হবে এবং তাদেরকে পশ্চাৎপদতা থেকে উঠিয়ে আনতে হবে। ঐ সকল কট্টরপন্থীকে নাকচ করতে হবে, যারা নারী সমাজের মৌলিক অধিকার প্রদানে প্রতিবন্ধক। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

---

৩৩. সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৬১

৩৪. সূরা আল-মুমতাহানা, ৬০ : ৮-৯

"মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।[৩৫]

১০. শাসক নির্বাচনে জনগণের অধিকার ও শাসকের দায়িত্ব

প্রজাহিতৈষী শাসক নির্বাচনে জনগণের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এমন শাসক কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, যে জনগণকে ঘৃণা করে। জনগণ যখন শাসক নিযুক্ত করবে, শাসকের অধিকার সমুন্নত রাখার এবং তাকে সকল ভালো কাজে সাহায্য করতে হবে। আবার শাসকও জনগণের অধিকার রক্ষায় সর্বাধিক সচেষ্ট থাকবেন। এবিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে-

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে"।[৩৬]

১১. অর্থব্যবস্থায় ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ

মুসলিম উম্মাহকে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হতে হবে এবং অর্থনীতির ভিত্তি ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ এককথায় অর্থব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শের আলোকে মধ্যমপন্থার ওপর দাঁড় করাতে হবে।

১২. উম্মাহর একতার বন্ধন সুদৃঢ় করা

মুসলিমদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ ছাড় দিতে হবে। এলক্ষ্যে পরস্পরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভালোবাসা ও উদারতা প্রদর্শন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"...।[৩৭]

১৩. সামরিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে বিপুল বিত্তবৈভব দান করেছেন। এ সম্পদ দ্বারা কেবল আড়ম্বরপূর্ণ জীবন গড়ে চলবে না, বরং আল্লাহর যমীনে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামরিক দিক থেকেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

---

৩৫. সূরা আত-তাওবা, ৯ : ৭১
৩৬. সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৪১
৩৭. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ...

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এতদ্দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদের সম্পর্কে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদের বিষয়ে জানেন...।"

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহ আগ বাড়িয়ে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ চাপিয়ে দিবে না। তবে কেউ উৎপীড়ন করলে তাকে রুখে দিতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। যদি একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকদের ভালোবাসেন"।[৩৮]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সর্বকালের ও সর্বযুগের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দিয়েছেন। এই বিধান অনুসরণের মাঝেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। এর বিপরীতে রয়েছে সর্ববিধ অকল্যাণ ও বিপর্যয়। আসুন আমরা মহানবী (সা)–এর শেখানো একটি দু'আ পাঠ করি-

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

[আল্লাহুম্মা আসলিহ লী দীনী আল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমরী ওয়া আসলিহ লী দুনইয়াইয়া আল্লাতী ফীহা মা'আশী ওয়া আসলিহ লী আ-খিরাতী আল্লাতী ফীহা মা'আদী ওয়াজ'আলিল হাইয়াতা যিয়াদাতান লী ফী কুল্লি খাইরিন ওয়াজ'আলিল মাওতা রা-হাতান লী মিন কুল্লি শাররিন]

"হে আল্লাহ! তুমি আমার দীন পরিশুদ্ধ করে দাও, যে দীন আমার রক্ষাকবচ। তুমি সংশোধন করে দাও আমার দুনিয়াকে, যেথায় আমার রিযিক রয়েছে। তুমি আমার অখিরাতের জীবনকে কল্যাণময় করে দাও, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তুমি আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করো, প্রতিটি কল্যাণকর কাজের জন্য এবং তুমি আমার মৃত্যুকে আরামদায়ক করে দাও সবকিছুর অনিষ্ট থেকে"।[৩৯] ■

---

৩৮. সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ৯

৩৯. মুসলিম, কিতাবুয যিক্‌রি ওয়াদ-দু'আয়ি ওয়াত-তাওবা ওয়াল ইসতিগফার, বাব : আত-তাওয়াউয মিন শাররি মা আমিলা ওয়া মিন শাররি মা-লাম ই'য়ামাল, নং ৭০৭৮

৩০ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

বিগত সরকারের ধর্ম ও নৈতিকতাহীন শিক্ষানীতি : আমাদের সচেতনতা

প্রফেসর আর. কে. শাব্বীর আহমদ

ক্ষমতাচ্যুত (০৫.০৮,২০২৪) আওয়ামী সরকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন ও অনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা চালুর হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও ট্রান্সজেন্ডার পদ্ধতিকে পাঠ্যভুক্ত করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের চরিত্র ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। বানর থেকে মানবসৃষ্টির কাল্পনিক তত্ত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে বানরের লাফ, বেঙের লাফ শিখিয়ে তাদের মনুষ্যত্ববোধ ও ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করার এবং শরীফ থেকে শরীফার গল্প ফেঁদে একজন পুরুষকে কাল্পনিক নারী বানানোর চক্রান্তে সমকামিতাকে কৌশলে বৈধ করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলো।

৭ম-৯ম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের যৌন সচেতনতার নামে বাসরঘর সাজানো, মেয়েদের মাসিক ঋতুর মতো সেনসেটিভ বিষয় এবং ছেলে-মেয়ে উভয়ের সম্মতিতে যৌন চর্চাকে দোষের কিছু নয়, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন আপত্তিকর বিষয় পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করেছে।

শিক্ষকদেরকে কুকুরের ডাক, বিড়ালের ডাক, বানরের ডাক, শেয়ালের ডাক, হনুমানের ডাক, বেঙের ডাক, আচরণ ও লাফালাফির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা না পেয়ে বিবেকহীন প্রাণীর মতো কলে-কারখানার শ্রমিক হয়ে গোলামির জাতিতে পরিণত হয়।

আল্লাহর ক্ষমতাকে খর্ব করার মানসিকতায় ব্র্যাক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বলা হয় আল্লাহর কাছে চকলেট চাও। চকলেট না পেলে শিক্ষক কর্তৃক চকলেট দিয়ে বলা হয়, আল্লাহ তো চকলেট দেয়নি। চকলেট দিয়েছে ম্যাডাম। তাহলে ম্যাডামেরও আল্লাহর মতো শক্তি আছে। (নাঊযুবিল্লাহ)

নৈতিক, মানবিক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণ না দিয়ে শিক্ষকদেরকে কুকুরের ডাক, বিড়ালের ডাক, বানরের ডাক, শেয়ালের ডাক, হনুমানের ডাক, বেঙের ডাক, আচরণ ও লাফালাফির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা না পেয়ে বিবেকহীন

প্রাণীর মতো কলে-কারখানার শ্রমিক হয়ে গোলামির জাতিতে পরিণত হয়।

সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, গবেষণা, দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস করে একটি মানবেতর, ইতর শ্রেণির জনগোষ্ঠী তৈরির জন্য বিদেশি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিগত পদলেহী, লেজুড়বৃত্তিক সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন, অনৈতিক শিক্ষা চালু করার ঘৃণ্য প্রয়াস চালিয়েছে। যার সর্বনাশা পরিণতি থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য সুশীল সমাজকে একটি উন্নত কর্মমুখী জাতি গঠনের লক্ষ্যে মানবিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশন :

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৯টি শিক্ষা কমিশন গঠন হয়েছে। যার সুপারিশকৃত কোনো শিক্ষানীতিতেই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের তাহজিব-তামাদ্দুন, ধর্ম-দর্শন ও জীবনবোধের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়নি। কুদরত-এ-খুদার শিক্ষানীতির ছায়ায় গঠিত বিগত সরকারের শিক্ষানীতিতে ৯০ শতাংশেরও বেশি এ দেশের জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও বিশ্বাসের পরিপন্থি শিক্ষা কারিকুলাম চালুর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে ভিন্ন আদলে।

১৯৭১ সালের পর প্রবর্তিত বাংলাদেশের সব শিক্ষাকমিশনে মাধ্যমিক স্তরে অবহেলিতভাবে কিছু ধর্মীয় শিক্ষা চালু রাখা হলেও উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার কার্যকরী কোনো নীতিমালা না থাকায় উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও কর্মজীবীদের মধ্যে নৈতিকতার চরম সংকট দেখা দিয়েছে। যার ফলে সমাজ-প্রশাসনে সততা ও স্বচ্ছতা বিদায় নিতে শুরু করেছে। আধুনিকায়নের নামে মাদরাসা শিক্ষার মৌলিকত্ব ধ্বংস করে স্কুলের কারিকুলাম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সময় যতো এগিয়ে যাচ্ছে, বাড়ছে শিক্ষিতের হার, মাথাপিছু আয় ও কর্মজীবী মানুষ সংখ্যা। আর সে হারে বাড়ছে নানা ধরনের অনৈতিক অনাচারও।

ধর্মহীন শিক্ষানীতির প্রাক কথন ও অসারতা :

পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা সেক্যুলার শিক্ষানীতিকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আচরণগত জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরি করে নিজেদের নিরপেক্ষ ও সার্বজনীন দাবি করলেও মূলত তা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ যেমন- দৃষ্টবাদ (Positivism), খণ্ডবাদ (Reductionism), ঐতিহাসিকতাবাদ (Historicism) এর ছায়ারূপ বা অনুরূপ হয়েছে।

মানবরচিত খণ্ডিত দর্শনের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ কল্যাণমুখী জ্ঞান অহীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে শুধু প্রকৃতিবাদের ওপর কোনো নীতিমালা প্রতিস্থাপন করলে তার অনিবার্য পরিণতি হয় ইন্দ্রিয়বোধ্যতা (Perseptibilty), পরিমাপযোগ্যতা (Measurability) ও বস্তুজাগতিকতা (Materialism)। যা অতিন্দ্রিয়তা (Imperceptibility) ও অপরিমাপযোগ্যতার (Immeasurability) ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্যের সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি বড় প্রতিক্রিয়া হলো সামাজিক প্রকোষ্ঠকরণ (Social compartmentalization) প্রভাব বিস্তার করা। দার্শনিক এলাসডেয়ার ম্যাকইন্টায়ারের ভাষায়, 'সামাজিক প্রকোষ্ঠকরণ নীতি হচ্ছে জীবনের নানা ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ যুক্তি ও বিধি-ব্যবস্থায় আবদ্ধ হয়ে পড়া। ফলে একজন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ভূমিকার মুখোমুখি হলে একক মানবিক সত্তা হিসেবে তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হয়, মানসিকতায় দানা বাঁধে নানা টানাপোড়েন ও অস্থিরতা।'

ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ায় পশ্চিমা জনগোষ্ঠীতে সেক্যুলার দর্শন প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমান কালে এ সেক্যুলার দর্শন হচ্ছে Liberalism বা উদারতাবাদ। এ মতবাদের প্রধান দিক হচ্ছে সামষ্টিকতার ওপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রাধান্য দেওয়া। লিবারেল মতবাদের মূলে রয়েছে Harm principle বা 'ক্ষতির নীতি'। লিবারেলিজমের অন্যতম প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিলের মতামত : 'the only purpose for which power can rightfully be exercised over any member of a civilised community againist his will is to prevent harm to others.' অর্থাৎ কোনো সভ্য সমাজের একজন সদস্যের উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেবল তখনই ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যখন তা দ্বারা তাকে সমাজের অন্য সদস্যকে ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখা হয়।

সেক্যুলার স্বাতন্ত্রবাদে ধর্মীয় শিক্ষা না থাকায় মানুষ পরিবার ও সমাজের বাঁধন ছিন্ন করে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। ফলে বাড়ছে আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদিতা। এ দুটো একে অপরের পরিপূরক। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের অনুপস্থিতিতে যৌনাচারেরও প্রতিবন্ধকতা উঠে যাচ্ছে। বিয়ে নামক সামাজিক অপরিহার্যতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে যৌনতা, বেহায়াপনা। বিয়ে বহির্ভূত অবাধ যৌন সম্পর্ককে পাশ্চাত্যের মতো আমাদের সিলেবাসে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের উপনিবেশগুলো বিশেষ করে পাক-ভারতে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে ক্ষতি হয় আরো অতলে। ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থার কেরানি তৈরির জন্য এবং পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত জনগোষ্ঠী তৈরির প্রয়াস ছিল এই সেক্যুলার শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য।

ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের উপনিবেশগুলো থেকে উচ্ছেদকালে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত চাটুকার শ্রেণির কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে যায়। ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে পাক-ভারতের মতো স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর শাসকগোষ্ঠীও ঔপনিবেশিকবাদীদের প্রবর্তিত ধারায় প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সেক্যুলার শিক্ষা-সংস্কৃতির কাঠামোকেই চালু রাখে, যা প্রকৃত অর্থে নিও কলোনিয়ালিজম নামে একটি নতুন ফেনোমেনোনের উদ্ভব ঘটায়।

ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা :

বাংলাদেশে ধর্ম ও নৈতিকতাহীন শিক্ষাব্যবস্থার রূপায়ন শুরু হয় কুদরত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশনের আলোকে, পরবর্তীতে কবির চৌধুরী শিক্ষা কমিশনও এ ধারায় আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। বিগত আওয়ামী শাসকগোষ্ঠীও সেক্যুলার শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলাম ধর্মশিক্ষাকে ঐচ্ছিক করে নৈতিকতাকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চালিয়েছে।

ইসলামি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো, গণ মানুষের মনে সার্বভৌম সত্তা আল্লাহ তা'আলার গোলামি ও আনুগত্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর সন্তোষ ও পরকালীন মুক্তিলাভের চেতনা জাগ্রত করা, সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা অর্জন এবং খিলাফত পরিচালনা ও মানবতা প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা, দক্ষতা অর্জন করা। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা কারিকুলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এ শিক্ষাব্যবস্থা জীবনের কোনো মহৎ গুণাবলি ও যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

একটি জাতি যখন নৈতিক মূল্যবোধ শূন্য হয়, তখন সে জাতি আদর্শহীন, দেউলিয়া হয়। ইসলামবিদ্বেষী, সেক্যুলারগোষ্ঠী এ লক্ষ্যেই কাজ করছে।

একটি জাতি যখন নৈতিক মূল্যবোধ শূন্য হয়, তখন সে জাতি আদর্শহীন, দেউলিয়া হয়। ইসলামবিদ্বেষী, সেক্যুলারগোষ্ঠী এ লক্ষ্যেই কাজ করছে। তারা এ ধারার শিক্ষা চালু করতে চায় দেশের মানুষকে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের মানসিক দাস ও যান্ত্রিক শ্রমিক বানানোর জন্য। যাতে সাধারণ জনগোষ্ঠী স্বাধীন দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। স্বদেশের সমৃদ্ধি ও সর্বজনীন কল্যাণের জন্য দক্ষ, আত্মত্যাগী মানুষের জন্ম যেন আর না হয়।

আমাদের করণীয় ও সচেতনতা :

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকীদা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকুলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে সংগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমাদেরকে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সরকারের কাছে দাবি পেশ করতে হবে।

নতুন শিক্ষাকারিকুলামে ইসলাম বিরোধী শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রবেশের অপচেষ্টাকে রোধ করার জন্য বর্তমান সরকারের কাছে সর্বজনগ্রাহ্য নীতিমালা পেশ করতে হবে।

সর্বস্তরের জনগোষ্ঠী, অভিভাবক ও কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামি আদর্শ ও নৈতিকতাবিরোধী সেক্যুলার শিক্ষাধারার ব্যাপারে সতর্ক, সচেতন করে তুলতে হবে।

ডারউইনি বিবর্তনবাদ ও ট্রান্সজেন্ডারসহ সব ধরনের চরিত্র বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে

পত্র-পত্রিকা ও স্যোসাল মিডিয়ায় লেখালেখি ও যুক্তিভিত্তিক বক্তব্যের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

রাজনৈতিক দল ও সরকারি নির্দেশনায় দেশের বেশির ভাগ মানুষের চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ ও আদর্শের মাপকাঠিতে শিক্ষানীতি সংস্কারের কার্যকরী পদক্ষেপের জোর দাবি জানাতে হবে।

সৎ, যোগ্য, প্রশিক্ষিত শিক্ষাবিদদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সর্বজনীন দীনী শিক্ষা, নৈতিকতা, দেশপ্রেম ও মানবতাবাদী সুদূরপ্রসারী চেতনা সঞ্চারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পারিবারিক পরিমণ্ডলে, মাসজিদে, মক্তবে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে।

ফেসবুক, ইউটিউব, টেলিভিশনের মতো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও টকশোতে ধর্ম, নৈতিকতা, দেশপ্রেম বিষয়ে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

জাতীয় পর্যায় থেকে সকল মানুষের কাছে ইসলামের সর্বজনীন শিক্ষা, সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের ব্যাপক আয়োজন করতে হবে।

আদর্শিক ও যুগোপযোগী বিজ্ঞান, প্রযুক্তির উপর সহজ-সাবলীল তথ্যসমৃদ্ধ সাময়িকী, ম্যাগাজিন, পুস্তকাদি রচনায় শিক্ষাবিদ, কলামিস্ট, লেখকদের আত্মনিয়োগ এখন সময়ের অনিবার্য দাবি।

উচ্চশিক্ষার গবেষণায় খোদাহীন বস্তুজাগতিক ভোগবাদী শিক্ষার কুপ্রভাবের বিপরীতে ইসলামের যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

তাহলে আদর্শবান, দক্ষ নাগরিক গড়ে উঠবে। যাদের মাধ্যমে দেশ উন্নত নৈতিকতায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে। আমাদের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকবে চিরদিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন। ■

তথ্যসূত্র :

১. সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া
২. ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব
৩. এন টি সি বি কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষা কারিকুলাম
৪. এন টি সি বি আয়োজিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২৪
৫. ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিকল্পনা
৬. কুদরত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশন
৭. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব : সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী
৮. এনসাক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

৩৬ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

ইসলাম মানবপ্রকৃতির সহায়ক ও উপযোগী একটি জীবন বিধান। মানবজীবনের সামগ্রিক দিক পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ আলোচিত হয়েছে ইসলামে। মানুষের জীবনের কোন প্রয়োজনই ইসলামে উহ্য নেই। একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো সম্পর্কেও ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কেও ইসলামে রয়েছে বিশদ আলোচনা। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সতর্কতা সত্ত্বেও কোন রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হয়ে গেলে এর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার প্রতিও রয়েছে জোরালো তাগিদ। সাহাবায়ে কিরামের মাঝে কেউ অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তার সেবা করার জন্য হাজির হয়ে যেতেন। যা তাঁর সীরাত গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের সেবা করেছেন এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন। রাসূল (সা)এর একজন গোলাম ছিলো যিনি প্রথমে ইয়াহুদী ছিলেন পরে রাসূল (সা)এর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) রোগীর কাছে পৌঁছে তার শিয়রে বসতেন। তার যথাযথ সেবা করার চেষ্টা করতেন ও তার জন্য দু'আ করতেন। তিনি রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। রোগীকে প্রশ্ন করতেন এভাবে যে, তুমি কেমন আছে? তার প্রয়োজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। কী খেতে চাইতো তা প্রশ্ন করতেন এবং সে খাদ্যে যদি তার কোনো ক্ষতি না হতো, তাহলে তা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

রাসূল (সা) রোগীর কাছে পৌঁছে তার শিয়রে বসতেন। তার যথাযথ সেবা করার চেষ্টা করতেন ও তার জন্য দু'আ করতেন। তিনি রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। রোগীকে প্রশ্ন করতেন এভাবে যে, তুমি কেমন আছে? তার প্রয়োজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুস্থতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সুস্থতা প্রতিটি মানুষের কাম্য। সুস্থতা চায় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সুস্থতা-অসুস্থতার উপর ভিত্তি করে মানুষের জীবনযাত্রা ও কর্ম-পরিধি আবর্তিত। স্বাস্থ্যের যত্নে ইসলাম বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.

"আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"[১]

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।"[২]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.

"দুর্বল মুমিনের তুলনায় সবল মুমিন **উত্তম** ও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।"[৩]

অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ. قُلْتُ بَلَى. قَالَ : فَلاَ تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ. قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ فَقُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ. قَالَ : فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ . قَالَ : فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ. قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ قَالَ : نِصْفُ الدَّهْرِ.

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সা) আমার নিকট এসে বললেন, আমাকে কি এ খবর জানানো হয়নি যে, তুমি সারারাত সালাতে অতিবাহিত কর। আর সারাদিন সিয়াম পালন কর। আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, তুমি এ রকম করো না। রাতের কিয়দংশ সালাত আদায় কর, আর ঘুমাও। সিয়াম পালন কর, সিয়াম ভঙ্গও কর। তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে। তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে, আর তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। নিশ্চয়ই তুমি তোমার আয়ু দীর্ঘ হবার আশা কর। কাজেই প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা, নিশ্চয়ই প্রতিটি নেক কাজের পরিবর্তে তার দশগুণ সাওয়াব দেয়া হয়।

---

১. আল-কুরআন, ১৭ : ৮২

২. আল-কুরআন, ১৭ : ৮২

৩. মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাস, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং-২৬৬৪

সুতরাং এভাবে সারা বছরই সিয়ামের সাওয়াব পাওয়া যায়। তখন আমি কঠোর ব্যবস্থা চাইলে, আমাকে কঠোর ব্যবস্থা দেয়া হলো। আমি বললাম, এর চেয়েও অধিক পালনের সামর্থ আমার আছে। তিনি বললেন, তা হলে তুমি প্রতি সপ্তাহে তিনদিন সিয়াম পালন কর। তখন আমি আরও কঠোর ব্যবস্থা চাইলে, আমাকে কঠোর ব্যবস্থা দেয়া হলো। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও অধিক সিয়ামের সামর্থ রাখি। তিনি বললেন, তবে তুমি আল্লাহ্‌র নাবী দাউদ (আ)এর সিয়াম পালন কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নাবী! দাউদ (আ)এর সিয়াম কী রকম? তিনি বললেন, আধা বছর সিয়াম পালন।[৪]

স্বাস্থ্য সচেতনায় কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনা

ভরা পেটে খাবার না খাওয়া : ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে যখন ক্ষুধা পাবে কেবল তখনই খাবে, অতিরিক্ত খেতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

"আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় কর না; নিশ্চয় অপচয়কারীকে তিনি ভালোবাসেন না।"[৫]

কারণ অতিরিক্ত খাওয়া যা হজম হয় না, তা অপচয়েরই শামিল। তাই ভরা পেটে অতিরিক্ত খাওয়া একান্তই বর্জনীয়।

রোগ হলে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা নেয়া : ইসলামে কেউ অসুস্থ হলে খুব দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার জন্য জোরালো তাকিদ দেয়া হয়েছে। এজন্য নাবী (সা) স্বীয় সাহাবীদের দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি নিজে অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَدَاوَى فَقَالَ : تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ.

উসামাহ ইবনু শরীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সা)এর নিকট এসে দেখলাম তাঁর সাহাবীদের মাথার উপর যেন পাখী বসে আছে, অর্থাৎ শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। আমি সালাম দিয়ে বসলাম। অতঃপর এদিক-সেদিক হতে কিছু বেদুঈন এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? তিনি বললেন, তোমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করো; কেননা মহান আল্লাহ একমাত্র বার্ধক্য ছাড়া সকল রোগেরই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন।'[৬]

---

৪. বুখারী, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারুর ফিকর, তা.বি.), হাদীস নং-৬১৩৪।

৫. আল-কুরআন, ৭ : ৩১

৬. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশ-আশ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-৩৮৫৭

যেহেতু মহান আল্লাহ রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন, তাই এ নেয়ামত গ্রহণ করাই উচিত।

রাতে বেশি বেশি 'ইবাদত বন্দেগী করা : রাতে 'ইবাদত বন্দেগীতে স্বাস্থ্যের অনেক উপকার বিদ্যমান রয়েছে। এতে রুহ ও কলব সতেজ হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ بِلاَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ –ﷺ– قَالَ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ.

বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা অবশ্যই রাতের 'ইবাদাত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের নিত্য আচরণ ও প্রথা। রাতের 'ইবাদাত আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, পাপকর্মের প্রতিবন্ধক, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং দেহের রোগ দূরকারী।[৭]

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঠ দেয়। প্রতি গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে, একটি গিঠ খুলে যায়, উযূ করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়, অতঃপর সালাত আদায় করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয়, উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলূষ কালিমা ও আলস্য সহকারে।[৮]

উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, রাতের 'ইবাদতের মাধ্যমে মানব শরীরের অনেক রোগ দূর হয়ে যায়।

ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করা : মানুষের গুপ্তাঙ্গে জমাকৃত ময়লা থেকে শরীরে অনেক রোগ-বালাই ছড়াতে পারে। আর মানুষ যেহেতু ডান হাতে পানাহার করে থাকে তাই হাদীসে পেশাব-পায়খানার সময় ডান হাতে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

---

৭. তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.), হাদীস নং-৩৮৯৫

৮. বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১১৪২

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.

'আবদুল্লাহ্‌র পিতা আবূ ক্বাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন পানি পান করবে, সে যেন তখন পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। আর তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে, সে যেন ডান হাতে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে এবং তোমাদের কেউ যখন শৌচ কার্য করে তখন সে যেন ডান হাতে তা না করে।[৯]

সাদা কাপড় পরিধান করা : পোশাক সভ্যতার প্রতীক। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান ফরজ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

"হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূসার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাক্ওয়ার পরিচ্ছদ, এটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"[১০]

যেহেতু পোশাক পরিধান একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তাই ইসলাম কী ধরনের পোশাক পরিধান করতে হবে তাও নির্দেশ করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

"ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা সাদা রঙ্গের পোশাক পর। কেননা, তোমাদের জন্য তা সবচাইতে উত্তম পোশাক। তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের এটা দিয়েই কাফন দাও।"[১১]

সুস্থতা সবচেয়ে মূল্যবান : ইসলামের অনেক বিধান ও 'ইবাদত সুস্থতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন : সুস্থ না থাকলে কেউ চাইলেও জামা'আতের সঙ্গে সালাত আদায় করতে মাসজিদে যেতে পারে না, সিয়াম পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, চোখের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেলে দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُه :

---

৯. বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৬৩০

১০. আল-কুরআন, ৭ : ২৬

১১. তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০১০

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ : شَبابَكَ قبلَ هَرَمِكَ ، وصِحَّتَكَ قبلَ سَقَمِكَ ، وغِناكَ قبلَ فَقْرِكَ ، وفَرَاغَكَ قبلَ شُغْلِكَ ، وحَياتَكَ قبلَ مَوْتِكَ.

'আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'পাঁচটি জিনিসের আগে আর পাঁচটি জিনিস মূল্যায়ন করো। বার্ধক্যের আগে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের আগে তোমার ধনাঢ্যতাকে, ব্যস্ততার আগে তোমার অবসর সময়কে এবং মৃত্যুর আগে তোমার জীবনকে।[১২]

তাই মানব শরীর অসুস্থ হওয়ার আগেই স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার জন্য ইসলাম আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছে এবং প্রতিটি মানুষেরই সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা উচিত।

পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি স্বভাব : সুস্থ দেহ ও মনের জন্য পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি গুণ আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। অপরিচ্ছন্নতা ও এলোমেলো পরিবেশ রোগব্যাধি ছড়ায়। আর ধীরে ধীরে এর প্রভাব মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাই মহানাবী (সা) এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ –ﷺ– : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. يَعْنِي الاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ. قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দশটি কাজ মানুষের ফিত্বরাত বা স্বভাবসুলভ: গোঁফ কাটা, দাড়ি ছেড়ে দেয়া, মিসওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের জোড়াসমূহ ধোয়া, বগলের পশম তুলে ফেলা, নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা, পানি দিয়ে ইস্তিনজা করা। মুস'আব (রা) বলেন, দশম কাজটি আমি ভুলে গেছি। সম্ভবতঃ সেটি হলো, কুলি করা।[১৩]

সর্বদা পবিত্র অবস্থায় থাকা : পবিত্র কুরআনের বক্তব্য লক্ষ্য করলে আমরা দেখি, আল্লাহ তা'আলা কুবাবাসীর প্রশংসা করেছেন অধিক পবিত্র হবার মানসিকতার জন্য। ইরশাদ হয়েছে,

فِيهِ رِجَال يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ.

"সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"[১৪]

---

১২. হাকিম, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল্লাহ, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহহাইন* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.), হাদীস নং-৭৮৪৬

১৩. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৩

১৪. আল-কুরআন, ৯ : ১০৮

তেমনি মহিলাদের মাসিক স্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার আলোচনা শেষে মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের।"[১৫]

একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)এর হাদীস পাঠ করলেও আমরা জীবনের নানা পর্যায়ে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বারোপ বিষয়ে বহু বিশুদ্ধ হাদীস খুঁজে পাই। পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় নানাভাবে নানা উপায়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সবচে বড় কথা পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন আবূ মালিক আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.

"পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।"[১৬]

কুরআন ও হাদীসের আলোকে রোগীর সেবা ও তার প্রতি কর্তব্য

ইসলাম মানবপ্রকৃতির সহায়ক ও উপযোগী একটি ধর্ম। মানবজীবনের সামগ্রিক দিক পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ আলোচিত হয়েছে ইসলামে। মানুষের জীবনের কোন প্রয়োজনই ইসলামে উহ্য নেই। একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো সম্পর্কেও ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কেও ইসলামে রয়েছে বিশদ আলোচনা। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সতর্কতা সত্ত্বেও কোন রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হয়ে গেলে এর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার প্রতিও রয়েছে জোরালো তাগিদ।

রোগীর সাথে সুন্দর ও তার সেবা করা প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশ

রোগীর সেবা-যত্ন করা একটি পূণ্যের কাজ। এ কাজের দ্বারা মানুষে মানুষে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ فَإِنّ ذَلِكَ لَا يَرُدّ شَيْئًا وَهُوَ يُطَيّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ

আবু সা'ঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা রোগীর কাছে যাবে, তখন তার আয়ুকে সুযোগ দাও। অর্থাৎ সুস্থতা ও কল্যাণের কথা বল। এটি রোগীকে সন্তুষ্ট করার তরিকা।[১৭]

---

১৫. আল-কুরআন, ২ : ২২২

১৬. মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২২৩

১৭. ইব্ন মাজাহ, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজিদ, *আস-সুনান*, (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.),খ. ১, পৃ. ১০৬, হাদীস নং-২৮৯।

এ হাদীসে চিকিৎসা বিষয়ে একটি অত্যন্ত কার্যকরী এবং উন্নত মানের নসিহাত আছে। তা হচ্ছে, রোগীর শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য এমন কথা বল, যার দ্বারা তিনি আনন্দ পান এবং তার শক্তি সঞ্চার হয় এবং স্বাভাবিক তাপ বৃদ্ধি পায়। যার সাহায্যে শরীর রোগকে নির্মূল করতে পারে।

রুগী পরিদর্শনে গেলে অনেক পূণ্যের অধিকারী হওয়া যায়। আর ইসলামে এর নির্দেশও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, সাওবান (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি রুগী পরিদর্শনে যায়, সে যতক্ষণ ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে অবস্থান করে।"[১৮] হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ –ﷺ–بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِى وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلاَمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالْقَسِّيِّ.

আল বারা ইবন 'আজিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাতটি বিষয় আদেশ ও সাতটি বিষয় নিষেধ করেন: জানাযার অনুসরণ করার হুকুম করেন এবং হুকুম করেন রুগী পরিদর্শন করা, দাওয়াত প্রদানকারীর ডাকে সাড়া দেয়া, নির্যাতিতকে সাহায্য করা, শপথ পূর্ণ করা, সালামের জবাব দেয়া, হাঁচি প্রদানকারীর জবাব দেয়া। আর আমাদেরকে নিষেধ করেন: রূপার পাত্র ব্যবহার, স্বর্ণের আংটি পরা, সাধারণ রেশমী কাপড়, মোটা রেশমী বস্ত্র, রেশমী কারুকার্য খচিত রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে।"[১৯]

শরীরের চিকিৎসা ও তার প্রকারভেদ

শারীরিক চিকিৎসার নিয়মাবলী তিনটি। যথা : স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ থেকে হেফাজাত এবং বদ রক্ত পুঁজ অপসারণ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এ তিনটি যথাস্থানে উল্লেখ করেছেন। সিয়ামের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

"সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ (সিয়ামের) সংখ্যা পূরণ করে নেবে।"[২০]

এ আয়াতে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোগের ওজর এবং মুসাফিরের জন্য তার সুস্থতা এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য সিয়াম ভঙ্গ করার অনুমতি দিয়েছেন। যাতে সিয়াম সফরে অধিক দৈহিক পরিশ্রম এবং জীর্ণতার কারণে এবং খাদ্য পানীয় না থাকার কারণে ক্ষতির

---

১৮. মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫৬৮।

১৯. বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১২৩৯; মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৬৬।

২০. আল-কুরআন, ২ : ১৮৪।

সম্মুখীন না হয়। শক্তি ও সুস্থতা রক্ষার জন্য মুসাফিরকে সিয়াম ভঙ্গ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করিও। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করিও না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদ্‌য়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হজ্জের সময় তিনদিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন-এই পূর্ণ দশদিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মাসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।"[২১]

এ আয়াতে রোগীকে এবং তাকে যার মাথায় উকুন হয় অথবা অন্য কোনো কষ্টদায়ক অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, তিনি ইহরামের অবস্থায় মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলবেন। যাতে কষ্টদায়ক জিনিষ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। যার চুলের গোড়ায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে রোগ সৃষ্টি হয়, মাথা মুন্ডালে লোমকূপগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং এ সকল বাইরের আবর্জনা থেকে লোমকূপ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার ফলে চলে যাবে। এ অপসারণ ক্রিয়ার উপর সকল অপসারণ বিষয় কিয়াস করা যেতে পারে। যা থাকার কারণে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। রোগ থেকে নিরাপদ থাকা। আল্লাহ তা'আলা অজুর আয়াতে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

"হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র

---

২১. আল-কুরআন, ২ : ১৯৬।

অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করো। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ করো এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং মাসেহ্ করবে মুখমণ্ডল ও হাত, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।"[২২]

এ আয়াতে রোগীকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, নিজের দেহকে রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য পানির পরিবর্তে মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের দিকে পরিবর্তন করা যাবে। সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার ব্যাপারে এ আয়াত বলে দেয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের চিকিৎসার তিনটি নীতি সম্বন্ধে অবহিত করেছেন, যা সকল স্বাস্থ্য সংরক্ষণের মূলনীতি। (চলবে)

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, মুন্সিগঞ্জ।

আল ফালাহ্ বিজ্ঞাপন

২২. আল-কুরআন, ৪ : ৪৩।

আল্লাহর পথে সম্পদ দান

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ তৌহিদ হোসাইন

ইসলামী পরিভাষায় 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' এর বাংলা অনুবাদ হল 'আল্লাহর পথে খরচ' যা আল্লাহর পথে সম্পদ দানের একটি ধরন মাত্র। কিন্তু এখানে সম্পদ বলতে অর্থ সম্পদ, স্বাস্থ্য সম্পদ, জ্ঞান সম্পদ ইত্যাদি পার্থিব সব ধরনের সম্পদকে বুঝানো হয়েছে।

অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে টাকা-পয়সা বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিকে বুঝায়। যেসব দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ বা প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা আছে, যার যোগান স্বল্পতা আছে, যা হস্তান্তরযোগ্য, বিনিময় বা বিক্রয়যোগ্য এবং যার বাহ্যিকতা আছে তাকেই সম্পদ বলে। তবে সম্পদ হতে হলে অবশ্যই বিনিময় মূল্য থাকতে হয়।

আল্লাহ খুশি হন এমন কাজে অর্থ ব্যয় করাই হচ্ছে, 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ।' আল্লাহর পথে অর্থসহ সব ধরনের সম্পদ ব্যবহারই আল্লাহর পথে সম্পদ দান হিসেবে গণ্য।

'ইনফাক' শব্দটির মূল ধাতু নাফাক, যার অর্থ সুড়ঙ্গ। সাধারণত সুড়ঙ্গের একদিক দিয়ে প্রবেশ করে আরেক দিক দিয়ে বের হওয়া যায়। আর এই নাফাক শব্দটির সঙ্গে মাল শব্দটি যোগ হলে এর অর্থ হয় সম্পদ খরচ করা, শেষ করা। এর মানে হচ্ছে, সম্পদ কারো হাতে কুক্ষিগত থাকার বস্তু নয়। সম্পদ একদিক দিয়ে আসবে আবার আরেকদিক দিয়ে খরচ হবে।

সাধারণ অর্থে অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে টাকা-পয়সা বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিকে বুঝায়।

অর্থনীতির পরিভাষায় মূলত যেসব দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ বা প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা আছে, যার যোগান স্বল্পতা আছে, যা হস্তান্তরযোগ্য, বিনিময় বা বিক্রয়যোগ্য এবং যার বাহ্যিকতা আছে- এই চারটি বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিই যার মধ্যে আছে কেবলমাত্র তাকেই সম্পদ বলে। তবে সম্পদ হতে হলে অবশ্যই বিনিময় মূল্য থাকতে হয়। সে বিনিময়মূল্য তাৎক্ষণিক কিংবা পরে পরিশোধযোগ্যও হতে পারে। সে কারণে অর্থনীতির পরিভাষায় শুধু প্রয়োজন পূরণের অবাধলভ্য সকল প্রকৃতি পণ্য যেমন বাতাস, পানি, সূর্যালোক ইত্যাদিকে সম্পদ বলা যাবে না। কারণ অর্থনীতির পরিভাষার সম্পদ হতে হলে মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতা, বস্তুর স্বল্পতা, বিনিময়

হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা ইত্যাদি ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। অথচ আমরা সবাই জানি এ সবই অমূল্য সম্পদ।

সুতরাং অর্থনীতির পরিভাষার বাইরেও সম্পদের বেশ কিছু সংজ্ঞা আছে যার জন্য সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্যের সব ক'টি না থাকলেও সমাজে তা সম্পদ হিসেবে গণ্য। ব্যবসায়িক কাজে লাগানো শেয়ারের মূলত তিন ধরনের মূল্য দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। ফেস ভেল্যু, মার্কেট ভেল্যু এবং বুক ভেল্যু। এ সবই একটি কোম্পানির ভিন্ন ভিন্ন মূল্যমানের সম্পদ।

ব্যবসায়িক পণ্যের পাশাপাশি ব্যক্তির সুনাম-মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সুনাম বা দায়দেনাকে intangible বা অস্পর্শনীয় সম্পদ বলা হয়। অথচ ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক সুনাম বা দায়দেনার কোনো বাহ্যিকতা নেই।

বস্তুগত সম্পদ যেমন হস্তান্তরযোগ্য তেমনি অবস্তুগত সম্পদও হস্তান্তরযোগ্য হতে পারে। তা নগদ হতে পারে, বাকিও হতে পারে। সে হিসেবে যা কিছুই মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগে এবং যার চাহিদা আছে-এ সবই সম্পদ হিসেবে গণ্য। যেমন, আল্লাহর পথে সময় দান এমনই সম্পদ দান তুল্য একটি কর্মকান্ড যাকে সম্পদের সাথে তুলনা করা যায়, কারণ যে কোনো কর্মকান্ডের জন্য সময় প্রয়োজন। এইভাবে মানুষের স্বাস্থ্য, মাটি, বাতাস, পানি ইত্যাদি যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাই-সবই সম্পদ। আল্লাহর পথে অর্থ দান করতে গেলেও সময়কে আমরা কাজে লাগাই।

দাতা-গ্রহীতার উদাহরণ

পুরো বিশ্ব টিকে আছে কেউ কিছু দান করে আবার কেউ কিছু গ্রহণ করে- এই নীতির উপর। প্রকৃতিতে আছে দুই ধরনের দাতা এবং বহু ধরনের গ্রহীতা। এক ধরনের দাতা যারা নিজের উপার্জিত বস্তুর সবটাই শুধু দান করে তৃপ্ত থাকে বা বাধ্য হয় কিন্তু নিজে ভোগ করে না। স্তন্যপায়ী প্রাণীর তৈরি করা দুধ যেমন, মায়ের দুধ, গাভীর দুধ, গাছের তৈরি করা অক্সিজেন, সূর্যের আলো, নদীর পানি, গাছের ফল, ক্ষেতের ফসল, ফুলের ঘ্রাণ ইত্যাদির সুবিধাদী নিজেরা ভোগ করে না বা প্রাকৃতিকভাবে ভোগ করার সুযোগও থাকে না।

আরেক ধরনের দান হল নিজেও কিছু ভোগ করার সুযোগ পায় এবং বাকি অংশ অপরের জন্য দান বা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যেতে পারে।

যেমন মৌমাছির সংগ্রহ করা মধু যা একটা সময়ে নিজেরাই খেয়ে ফেলে যদি মানুষ তা সংগ্রহ না করে। আবার মানুষ যা আয় করে তার খুব সামান্য অংশই নিজে ভোগ করে যেতে পারে, বাকি অংশ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায়।

ইসলামে দানের প্রকৃত অর্থঃ

দান বা 'সাদকাহ' শব্দটি আরবি মূল শব্দ 'সিদক' থেকে এসেছে।

স্বত্ব ত্যাগ করে কাউকে কিছু দেওয়াকেই সাধারণ ভাবে দান হিসেবে গণ্য করা হয়।

দান এর সমার্থক শব্দ সাহায্য। যেমন, অর্থ সাহায্য, ভাতা, যে কোনো ধরনের সেবা, পোশাক, খেলনা, উপহার, খাদ্য বা যানবাহন ইত্যাদি সবই দানের অন্তর্ভুক্ত।

শরীয়তে দান দুই ভাগে বিভক্ত। একটি এমন দান যা বিশেষ কিছু শর্তে মুসলিম ব্যক্তির বিশেষ কিছু সম্পদে ফরয হয়। এমন দানকে বলা হয় যাকাত। আর অন্য দানটি এমন যে, মুসলিম ব্যক্তিকে তা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু তার উপর অপরিহার্য করা হয়নি। এমন দানকে বলা হয় সাদকাহ।

আল্লাহ ধনীদের ওপর সম্পদের যাকাত এবং ওশর ফরজ করেছেন। আর সকলের জন্যই সাদকাহ নফল করেছেন।

১. দান মানে আল্লাহর পথে লাভজনক ব্যবসাঃ

বাহ্যত দানে একজনের সম্পদ আরেকজনের কাছে চলে যায়, ফলে সম্পদ কমে যায়। কিন্তু পবিত্র কোরআনে দান-সাদাকাহকে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটা এমন ব্যবসা যার কখনও লোকসান হবে না, ধ্বংসও হবে না। বরং বহুগুণে তার লাভসহ মানুষকেই ফিরিয়ে দিবেন বলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আছে। আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিয্ক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না।"[১]

মহান আল্লাহ আরো বহু জায়গায় বান্দার সাথে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসাচুক্তির কথা বলেছেন যাতে শুধু বহুগুণে লাভই লাভ, লোকসানের ঝুঁকি নেই। যদিও আল্লাহ একে বলছেন ব্যবসা।

২. দান মানে জান দিয়ে এবং মাল ব্যয় করে আল্লাহর পথে জিহাদ করাঃ

যাকে আল্লাহ বলেছেন এমন একটি ব্যবসা যা মানুষকে পরকালের আযাব থেকে পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দিবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

"হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে।"[২]

এখানে মহান আল্লাহ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করাকে ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করেছেন।

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

---

১. সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৯।
২. সূরা সফ, ৬১ : ১০।

"(তা এই যে) তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।"[৩]

এখানে ঈমান ও জিহাদকে ব্যবসা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ এতেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো লাভ হবে। আর সে লাভ কি? জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ। এর থেকে বড় লাভ আর কি হতে পারে।

৩. দান মানে ঈমানদারদের জীবন এবং মাল সম্পদ আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেওয়া

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِه مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِه وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক ওয়াদা পালনকারী আর কে হতে পারে? অতএব, আল্লাহর সাথে এই কেনাবেচা চুক্তির জন্য আনন্দ কর, এটাই তোমাদের জন্য বড় সাফল্য।"[৪]

এই আয়াতেও মানুষের জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করাকে ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, মানুষের জান এবং মালের মালিক আল্লাহ। তারপরেও আল্লাহ এই জান এবং মাল মানুষের কাছ থেকে খরিদ করে নেওয়ার কথা বলছেন। বিনিময় হিসেবে আল্লাহ সুসংবাদ দিচ্ছেন জান্নাতের। যারা আল্লাহর সাথে এভাবে জীবন-মাল কেনাবেচার চুক্তিতে আবদ্ধ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তারা কতই না সৌভাগ্যবান।

৪. দান মানে আল্লাহকে ঋণ দেয়া যা বহুগুণে ফেরতযোগ্যঃ

ইসলামে দান মানে মানুষের কাছে আল্লাহর চেয়ে নেয়া ঋণ যা মানুষকে বহুগুণে বর্ধিত আকারে ফিরিয়ে দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَه لَه وَلَه اَجْرٌ كَرِيْمٌ

"এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।"[৫]

আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেওয়ার অর্থ তাঁর পথে খরচ করা, দান-সাদাকাহ করা। মজার বিষয় হল, এই মাল যা মানুষের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য, সেই জান-মাল কিন্তু আল্লাহরই দেওয়া। তা সত্ত্বেও সেটাকে ঋণ বলে আখ্যায়িত

---

৩. সূরা সফ, ৬১ : ১১।
৪. সূরা আত তাওবাহ, ৯ : ১১১।
৫. সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১১।

করা আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়। তিনি এর প্রতিদান অবশ্যই দেবেন, যেমন ঋণ পরিশোধ করা অত্যাবশ্যক হয়।

৫. দান মানে অন্য মানুষের প্রতি সহমর্মীতা দেখিয়ে ও সহযোগিতা করে নিজের মাল সম্পদকে পবিত্র করা

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দু'আ কর, নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৬]

এই আয়াত থেকে চারটি মৌলিক বিষয় বের হয়ে আসছে।

প্রথমত: সাদকাহ মানে যাকাত হতে পারে, আবার নফল সাদাকাহও হতে পারে। এখানে নাবী (সা)কে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সাদকাহ দ্বারা তুমি মুসলিমদের জান-মাল পবিত্র কর। এতে এই কথাও প্রমাণিত হয় যে, যাকাত ও সাদাকাহ মানুষের আখলাক-চরিত্রকে পবিত্র করার একটি বড় উপায়।

দ্বিতীয়ত: দানগ্রহীতার উচিৎ দাতার জন্য দোয়া করা, যেমন এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজ পয়গম্বর (সা)কে দু'আ করার আদেশ দিয়েছেন এবং নাবী (সা) উক্ত আদেশ অনুযায়ী দু'আ করতেন।

তৃতীয়ত: এই সাধারণ আদেশ থেকে এটাও দলীল নেওয়া যায় যে যাকাত উসূল করার দায়িত্ব সমসাময়িক শাসক বা প্রতিষ্ঠানের।

চতুর্থত: যেহেতু আয়াতের শুরুটাই হয়েছে আদেশসুলভ শব্দ দিয়ে সেহেতু এটা অস্বীকার করা মানে যে কোনো চলমান শাসকগোষ্ঠী তা প্রদান করতে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে যেমন, আবু বাকর (রা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)গণ বাস্তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেখিয়েছেন।

৬. দান মানে সম্পদশালীদের কাছ থেকে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার আদায় করা।

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"[৭]

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"আর যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক- অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের।"[৮]

এর মানে হল, ধনীরা যে যাকাত দরিদ্রদের প্রদান করে থাকেন, তা কোনো দয়া

---

৬. সূরা আত তাওবাহ, ৯ : ১০৩।
৭. সূরা আয যারিয়াত, ৫১ : ১৯।
৮. সূরা মা'আরিজ, ৯০ : ২৪-২৫।

দাক্ষিণ্য নয়, বরং বঞ্চিতদের অধিকার। আর ধনীরা গরীবদেরকে যাকাত না দেওয়া মানে গরীবদেরকে দেয় নিজের যাকাত নিজেই খেয়ে ফেলা।

সমৃদ্ধ অর্থনীতির নিয়ম হল, সম্পদ বা টাকা সমাজে যত বেশী সঠিকভাবে আবর্তীত হবে, অর্থনৈতিক ভীত তত মজবুত হবে। আবার ইসলাম টাকার এই আবর্তন ঘুরে ফিরে একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে হোক তা চায় না। জগতে সাধারণ শ্রেণীর মানুষের সংখাই বেশী। এ জন্য কমসংখক ধনী উপরওয়ালাদের কাছ থেকে যত বেশী অর্থ বেশী সংখ্যক সাধারণ মানুষের দিকে আবর্তীত হবে, সমাজের চলমান অর্থনীতি তত শক্তিশালী হবে।

শ্রমিকরা যখন মালিকের অধীনে কোনো কাজ করে, তখন অর্থের প্রবাহ উপর থেকে নীচের দিকে আসে। শ্রমিকরা শ্রমের বিনিময়ে পায় টাকা, মালিকপক্ষ টাকার বিনিময়ে পায় পণ্য উৎপাদন। আবার ধনীরা যখন যাকাত বা দান-সাদাকাহ করে তখনও অর্থের প্রবাহ উপর থেকে নীচের দিকে আসে। ইসলাম যাকাত ফরয করে এবং দান-সাদাকাহকে উৎসাহিত করে অর্থের ভার্টিকাল আবর্তনের চমৎকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে করে দিয়েছেন।

উপর থেকে নীচের দিকের এই অর্থ প্রবাহ নানানভাবে হতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হল ব্যবসা। ব্যবসার টাকার প্রবাহ হরিজন্টাল, অবলিক এবং ভার্টিকাল এই তিনভাবেই হতে হয়। অর্থের ভার্টিকাল প্রবাহের মাধ্যমেই মূলত ধনিক শ্রেণী থেকে টাকা গরীব শ্রেণীতে চলে আসে। ইসলাম ব্যবসার পাশাপাশি যাকাত এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে অর্থের এই ভার্টিকাল প্রবাহ সৃষ্টির সুযোগ রেখে দিয়েছে। যেমন, শ্রমিকরা যখন মালিকের অধীনে কোনো কাজ করে, তখন অর্থের প্রবাহ উপর থেকে নীচের দিকে আসে। শ্রমিকরা শ্রমের বিনিময়ে পায় টাকা, মালিকপক্ষ টাকার বিনিময়ে পায় পণ্য উৎপাদন। আবার ধনীরা যখন যাকাত বা দান-সাদাকাহ করে তখনও অর্থের প্রবাহ উপর থেকে নীচের দিকে আসে। ইসলাম যাকাত ফরয করে এবং দান-সাদাকাহকে উৎসাহিত করে অর্থের ভার্টিকাল আবর্তনের চমৎকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে করে দিয়েছেন। আমরা জানি, অর্থের যত বেশী ভার্টিকাল আবর্তন হবে, তত বেশী পণ্যদ্রব্য কনজিউম হবে, যত বেশী পণ্য কনজিউম হবে, প্রয়োজনের তাগিদে তত বেশী পণ্যের উৎপাদন বাড়বে, আর বেশী পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে বেশী বেশী অর্থ বিনিয়োগের দরকার হবে। এইভাবে যত বেশী বিনিয়োগ হবে সমাজের অর্থনীতি

তত বেশী শক্তিশালী হবে। ইসলামী অর্থনীতির বড় বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলাম টাকা দিয়ে টাকার ব্যবসা করে না, বরং টাকা দিয়ে পণ্যের ব্যবসা করে, যা মূলত খুবই যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক।

৭. দান মানে আল্লাহ ও তার রাসূলের সান্নিধ্য লাভ, রহমত, দু'আ ও তওবা কবুলের হাতিয়ার

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِه اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"বেদুঈনদের কেউ কেউ আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর নিকট নৈকট্য ও রাসূলের দো'আর উপায় হিসেবে গণ্য করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় তা তাদের জন্য নৈকট্যলাভের মাধ্যম। অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৯]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

সাদাকাহ প্রদানকারীর জন্য নাবী (সা) এই বলে দু'আ করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশের উপর রহমত বর্ষণ করুন।"[১০]

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত, "আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাহ, তুমি খরচ কর, তাহলে তোমার জন্য খরচ করা হবে।"[১১] অন্যের জন্য খরচ করলে আল্লাহ নিজে তার জন্য খরচে উদ্যোগী হয়।

শুধু তাই নয়, সাদকার সাথে দানকারীর তাওবা কবুলের সম্পর্ক আছে।

আল্লাহ বলেন,

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সদাকা গ্রহণ করেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী।"[১২]

৮. দান পাপ ও বিপদ মোচনের হাতিয়ার

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"তোমরা যদি সাদাকাহ প্রকাশ্যে কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে 'আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"[১৩]

---

৯. সূরা আত তাওবাহ, ৯ : ৯৯।
১০. বুখারী, মুসলিম।
১১. সহীহ আল বুখারী।
১২. সূরা আত তাওবাহ, ৯ : ১০৪।
১৩. সূরা আল বাকারাহ, ২ : ২৭১।

একটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন যে, "সাদাকা মন্দের সত্তর দরজা সরিয়ে দেয়।"

"তোমরা দান কর, কারণ দান তোমাদের গুনাহ মিটাবে এবং বিপদ থেকে মুক্ত করবে।"[১৪]

দান তোমাদের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবে এবং অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা হিসেবে কাজ করবে।[১৫]

৯. দান মানে ভিক্ষা দেয়া নয়, বরং মানবিক সহযোগিতা আর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সুবিধাবঞ্চিতদের পাশে থাকা।

এই পৃথিবীর সকল মানুষ জ্ঞানে, ধনে, শারিরীক সক্ষমতা আর ক্ষমতায় কেউ কারো সমান নয়।

ভূবনে কারও ধনী বা গরীবের ঘরে জন্ম নেওয়া মানে এই নয় যে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তি বা পরিবারের উপর সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট। উচুঁ-নীচু করে মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর আল্লাহর একটাই উদ্দেশ্য, আর সেটা হল একজনকে দিয়ে আরেকজনকে পরীক্ষা করে নেওয়া, যাকে যা দেওয়া হয়েছে তাই দিয়ে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ/অনুত্তীর্ণের উপরই পরকালে জান্নাত/জাহান্নাম।

আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚ وَاِنَّه لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"আর তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যাকে যা দেয়া হয়েছে তা দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমার রব দ্রুত শাস্তি দানকারী এবং পরমদয়ালু ও ক্ষমাশীল।"[১৬]

এ জন্যই একজন সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি সুবিধভোগী ব্যক্তির উপর অনেক বড় পরীক্ষা। আমরা নানান ভাবে অসহায়কে সহায় করে তুলতে পারি। তবে সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল অসহায়ের জন্য স্থায়ী এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান করে দেওয়া, যাতে করে অসহায় আত্মনির্ভশীল ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠতে পারে। (চলবে)

লেখক : অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (প্যাথলজি বিভাগ), নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ। প্রকল্প পরিচালক, ডক্টরস ট্রাস্ট কিডনি ডায়ালাইসিস এন্ড ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার, শ্যামল বাংলা রিসোর্ট এন্ড কনভেনশন সেন্টার, তারানগর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

---

১৪. তিরমিজী।

১৫. মুত্তাফাকুন আলাইহে।

১৬. আনআম, ৬ : ১৬৫।

ভিয়েতনাম : কমরেডদের বোধোদয়

মীযানুল করীম

বিশ্বের অনেক দেশ এখন সাধারণত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলছে। এমনকি সমাজবাদী দেশগুলোর একটি অংশের নেতা গণচীন। তার অনুসারী ভিয়েতনাম, লাউস, উত্তর কোরিয়া ও কিউবা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে দাবী করলেও আগের মত সমাজতন্ত্রী নাই। এখনকার যুগে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধনতন্ত্রকে অনুসরণ করছে, সমাজতন্ত্রকে নয়। এখনকার মিশ্র অর্থনীতির দেশগুলোও মূলত: ধনতন্ত্রকে অনুসরণ করে চলেছে। বাংলাদেশের এ থেকে শিক্ষা নেয়ার আছে। ভিয়েতনামের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে। ভিয়েতনাম নিজেকে সমাজতন্ত্রী দাবী করলেও মূলত: পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুসারী। এছাড়া তারপক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। সেজন্য সে যুদ্ধকালীন শত্রু যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও আতাত করতে দ্বিধা করেনি। আবার চীনের সাথেও রেখেছে গভীর সম্পর্ক। আসলে তা বলে সে মূলত: সমাজতন্ত্রী হয়ে যায় নি। নিজের স্বার্থে নিজেই পথ করে নিয়েছে। না সমাজতন্ত্রী, না পুঁজিবাদী।

যুদ্ধবিধস্ত দেশ হওয়ার অপবাদ তাদেরকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে। তবে এখন তৈরি পোশাক খাতে বিশ্বে তৃতীয়, ধান উৎপাদনে প্রথম, কফি উৎপাদন ও রফতানিতে দ্বিতীয়, মৎস প্রাণী আহরণে তৃতীয় ভিয়েতনাম। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তিমত্তার জানান দিচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) পরিসংখ্যান বলছে- ভিয়েতনাম গত দুই দশকে ব্যবধান গড়ে নিয়েছে। ২০০০ সালে বৈশ্বিক পোশাক রপ্তানিতে দেশটির হিস্যা ছিল .০৯ শতাংশ। সে সময় বাংলাদেশের হাতে ছিল ২.৬ শতাংশ বাজার। পরের এক দশকে ভিয়েতনামের বাজার হিস্যা ৩ গুণ বাড়লেও আমাদের দেশের মাত্র ১.৫ গুণের একটু বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বৈশ্বিক তৈরি পোশাকের বাজারে ৬.৪ শতাংশ হিস্যা ভিয়েতনামের দখলে।

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনাম গড়ে ১১ শতাংশ ও বাংলাদেশ ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে গত ১০ বছরে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'এশিয়ান টাইগার' নামে অভিহিত করা হয়- সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও হংকং কে। উন্নয়ন অর্থনীতিবিদরা ভিয়েতনামকে ইতিমধ্যেই এশিয়ান টাইগার আখ্যায়িত করা শুরু করেছেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের প্রশ্নে ভিয়েতনামের উদীয়মান অর্থনীতির গতি প্রকৃতি বোঝা দরকার।

১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভিয়েতনাম স্বাধীন দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। কখনোই কোন দেশের কাছে তারা ভিক্ষার হাত পাতেনি বা মাথা নত করেনি। এমনকি

অনুদান ও সফট লোনের আশায় জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েও আবেদন করেনি ভিয়েতনাম।

জনগণের মাথাপিছু জিডিপি ১৯৭৫ সালে ছিল মাত্র ৬৫ ডলার। ১৯৮৫ সালে ছিল ২৮৫ ডলার। ২০২৩ সালে ভিয়েতনামের মাথাপিছু নমিনাল জিডিপি ৪৩১৬ ডলার। যেটিকে বলা হচ্ছে অলৌকিক। ২০২৩ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫ শতাংশ। ২০২৩ সালে ভিয়েতনামের মাত্র ২ শতাংশ জনগণ দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করেছে।

এশিয়ান টাইগার হিসেবে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের নামও উল্লেখ করা যায়। মালয়েশিয়া একমাত্র মুসলিম দেশ যে, 'প্রোটন সাগা' নামে প্রাইভেট কার তৈরি করে রপ্তানি করছে।

ভিয়েতনামের ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রয়ে গেছে। চীনের সাথে ভিয়েতনামের সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ট ঠিক তেমনি পুঁজিবাদী দেশগুলো চীনের বিরুদ্ধে নানা রকম বিধি নিষেধ আরোপ করার কারণে তারা অনেক প্রকার সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। অথচ চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ট। কিন্তু ভিয়েতনাম সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে। অথচ আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ভিয়েতনামের চেয়ে উন্নত।

ভিয়েতনাম স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ১৯৬৪-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর পর্যন্ত। কিন্তু তার সাথে পুঁজিবাদের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করেছে।

ভিয়েতনামের মানবসম্পদ অধিকতর শিক্ষিত, শ্রমনিষ্ঠ ও সুদক্ষ। তাদের বন্দর, মহাসড়কসহ গণপরিবহন অত্যন্ত সুলভ। ফলে দেশটি অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। তারা ধনী ব্যক্তি সৃষ্টিকে সক্রিয়ভাবে বাধা দেয় এবং উন্নয়নের সুফল গ্রামের জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে।

ভিয়েতনাম স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ১৯৬৪-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর পর্যন্ত। কিন্তু তার সাথে পুঁজিবাদের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইন্ডিয়াসহ ১ ডজনের বেশি দেশের সাথে একই চুক্তি করেছে। কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা নয় বরং বিদেশী মানুষের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছে ভিয়েতনাম। ফলে বিভিন্ন কোম্পানি এগিয়ে আসছে ঐ দেশে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আগে Ecenemices and Political Science ছিল একই বিভাগে। জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক এই বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি এ বিভাগ থেকে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৩৬ সালে। সমাজতন্ত্র

অর্থনীতির বিষয় বলে জানিয়ে দেয়া হলেও এটা আসলে রাজনীতির ব্যাপার। তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভুল রাজনীতির কারণে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ব্লক ধসে পড়ে এবং রাশিয়ার পূর্বসূরী সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৬টি স্বাধীন দেশের উদ্ভব ঘটে। নতুন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ছিলে- মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্র এবং আরমেনিয়া, বেলারুশ, মোলদোভা, জর্জিয়া, ইউক্রেন, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি খ্রীস্টান রাষ্ট্র। পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র রাশিয়া তো ছিলই। এভাবেই বর্তমান রাশিয়ার উদ্ভব। এতে তাতারস্তান, চেচনিয়া, তাগেস্তান, ক্যারেলিয়া প্রভৃতি প্রজাতন্ত্র আছে। এইজন্য রাশিয়াকে রাশিয়ান ফেডারেশন বলা হয়। পূর্বতন সি.আই.এস মানে কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের কমনওয়েলথ। রাশিয়াতে বর্তমানে আর সমাজতন্ত্র নেই।

একইভাবে চীনের অনুসারী ভিয়েতনামেও আর সমাজতন্ত্র নেই। তাই সে একদা চরম শত্রু পুঁজিবাদের অন্যতম অস্ত্র ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করেছে। ভিয়েতনাম গত তিন দশকে মানব সম্পদকে উন্নত করেছে। তার জনশক্তির অর্ধেকই যুব।

ভিয়েতনামের সংবিধানে যতই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা থাকুক ওরা আসলে রাজনীতির দিক থেকে পুঁজিবাদী হয়ে গেছে। কারণ ওদের গুরু চীনও পুঁজিবাদী হয়ে গেছে।

ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক পথ পরিহার করে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছে। সে বাস্তববাদীতার স্বাক্ষর রেখেছে। যে সব রাষ্ট্রের সংবিধানে এখনও সমাজতন্ত্র কথা আছে তারা ভুল করেছে। যেমন শ্রীলঙ্কার নামের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক কথাটা আছে। ষাট দশকে এটা প্রগতিশীলতার স্বাক্ষর ছিলো এখন আর তা নেই। কারণ এখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুঁজিবাদকে আঁকড়ে ধরেছে। গণতন্ত্রের যে যতই বিরোধিতা করুক না কেন। অথচ চীন কমিউনিস্ট বিশ্বের একটি মূল ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। তার অনুসারী ভিয়েতনাম, লাওস, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র দিন দিন সমাজতন্ত্র পরিহার করে পুঁজিবাদকে অনুসরণ করছে। এখনকার গণতন্ত্রও পুঁজিবাদের একটি বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিকভাবে এইসব রাষ্ট্র যতই বিরোধীতা করুক তারা মূলত পুঁজিবাদীই। পুঁজিবাদের নিকট থেকে বের হওয়া এ যুগে সম্ভব না।

সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের কাছে পরাজিত হয়েছে। এটাই ভিয়েতনামের শিক্ষা। তারা অর্থনৈতিক ব্যাপারে আগেই গ্রহণ করে নিয়েছে। এখন রাজনৈতিক ব্যাপারে বাকী আছে। সেটাও তারা করবে অচিরেই। এ যুগ সমাজবাদের নয়। ■

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ সালাতে সাজদায় যাওয়ার নিয়ম জানতে চাই। সাজদায় যাওয়ার সময় আগে দুই হাত রাখতে হবে নাকি, দুই হাঁটু রাখতে হবে দলিলসহ জানতে চাই।

আশরাফুল ইসলাম
নড়াইল সদর।

উত্তর ঃ হাদীছে এসেছে,

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النبي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

"ওয়াইল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন সাজদা করতেন তখন তাঁর দুই হাত (মাটিতে) রাখার আগে দুই হাঁটু মাটিতে রাখতেন। আবার সাজদা থেকে উঠার সময় দুই হাঁটু উঠানোর আগে দুই হাত উঠাতেন।" (সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়-সালাত, অনুচ্ছেদ : সাজদার সময় মাটিতে হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতে হবে, হাদীছ নং-৮৩৮)

এই হাদীসটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সাজদা করার সময় মাটিতে হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতে হবে, অতপর হাত রাখতে হবে। অপর একটি হাদীছে এর বিপরীত কথা এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يُبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

তোমাদের কেউ যখন সাজদায় যাবে তখন উটের মতো করে বসবে না, বরং মাটিতে হাঁটু রাখার আগে দু'হাত রাখবে। (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং-৮৪০)

সুনান আবু দাউদে এই হাদীছের বঙ্গানুবাদের টীকায় লেখা হয়েছে- মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অনেকেই এই হাদীসটিকে 'মানসূখ' (রহিত) বলে গণ্য করেছেন।

আরব বিশ্বের একজন খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন এবং শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ ও হাদীছ বিশারদ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (র) স্বীয় ফাতাওয়া গ্রন্থ "ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম"-এ এই হাদীছটি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা করে লিখেছেন: "ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (র) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, হাদীছের শেষাংশ বর্ণনাকারীর (রাবীর) বর্ণনায় উল্টা হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায় এই হাদীছের শেষাংশটা এরূপ বলা হয়েছে: وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ দুই হাঁটু রাখার পূর্বে দুই হাত রাখবে।" অথচ সঠিক বাক্যটি এরূপ হবে : وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ দুই হাত রাখার আগে দুই হাঁটু রাখবে। কেননা হাঁটুর আগে হাত রাখলেই উটের মতো বসা হয়। উট বসার সময় প্রথমে তার হাত (সামনের পা) দুটো রাখে। উটের বসা প্রত্যক্ষ করলে এটাই প্রমাণিত হবে।

অতএব হাদীছের প্রথমাংশের সাথে শেষাংশের সামঞ্জস্য করতে চাইলে বলতে হবে : দুই

হাত রাখার আগে দুই হাঁটু রাখবে।

সবশেষে আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (র) তাঁর চূড়ান্ত মতামত উল্লেখপূর্বক লিখেছেন, "সুতরাং সাজদায় যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত সুন্নাত তরীকা হচ্ছে : মাটিতে দু'হাত রাখার আগে দুই হাঁটু রাখা।" (ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ৩৮২-৩৮৩)

সহীহ ইবন খুযায়মায় লিখেছে,

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى اَنَّ الْأَمْرَ بِوَضْعِ اليَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ مَنْسُوخٌ وأنَّ وَضْعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ نَاسِخٌ إِذْ كَانَ الأَمْرُ بِوَضْعِ اليَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ مُقَدَّمًا وَالأَمرُ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ مُؤَخَّرًا فَالْمُقَدَّمُ مَنْسُوخٌ وَالْمُؤَخَّرُ نَاسِخٌ

সাজদায় যাওয়ার সময় "মাটিতে দুই হাঁটু রাখার আগে দুই হাত" রাখার দলীলটি (হাদীছটি) মানসূখ বা রহিত হওয়ার এবং "দুই হাত রাখার আগে মাটিতে দুই হাঁটু" রাখার হাদীছগুলি নাসিখ বা রহিতকারী হওয়ার দলীল। কেননা দুই হাঁটু রাখার আগে দুই হাত রাখার নির্দেশনাটি (বিধানটি) ছিল আগেকার, আর দুই হাত রাখার আগে দুই হাঁটু রাখার নির্দেশনা এসেছে পরে। আর উসুলে হাদীছ বা হাদীছের মূলনীতি হলো: পরের নির্দেশনা দ্বারা পূর্ববর্তী নির্দেশনা রহিত হয়ে যায়। অতএব সাজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে দুই হাত রাখার আগে দুই হাঁটু রাখতে হবে। (সহীহ ইবন খুযাইমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬)

ইবনে খুযাইমা (র) সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

প্রথমদিকে আমরা যমীনে দুই হাঁটু রাখার আগে দুই হাত রাখতাম কিন্তু পরে আমাদেরকে দুই হাত রাখার পূর্বে দুই হাঁটু রাখার আদেশ করা হয়েছে। (সহীহ ইবন খুযাইমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬)

এ সম্পর্কে ইমাম ইবন তাইমিয়া (রহ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সাজদায় যাওয়ার সময় মুসল্লী তার দুই হাত মাটিতে রাখার আগে দুই হাঁটু রাখবে নাকি দুই হাঁটু মাটিতে রাখার আগে দুই হাত রাখবে। এই প্রশ্নের জবাবে তিনি লিখেছেন,

উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, উভয়টাই জায়েয আছে। অর্থাৎ মুসল্লীর ইচ্ছা সে চাইলে দুই হাত মাটিতে রাখার আগে দুই হাঁটু রাখতে পারে এবং সে চাইলে দুই হাঁটু রাখার আগে দুই হাতও রাখতে পারে। উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, উভয় অবস্থায় সালাত সহীহ ও বিশুদ্ধ হবে। তবে কোনটা উত্তম এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও ইমাম শাফেঈ (রহ) এর মতে এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ) এর একমতে সাজদায় যাওয়ার সময় দুই হাত মাটিতে রাখার আগে দুই হাঁটু

মাটিতে রাখা উত্তম। হাদীছে (সুনান গ্রন্থসমূহে) এসেছে,

إِنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ

তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সালাত আদায় করতেন (সাজদা করতেন) তখন দুই হাঁটু মাটিতে রাখতেন, তারপরে দুই হাতের তালু মাটিতে রাখতেন। আর যখন সাজদা থেকে উঠতেন তখন দুই হাত আগে উঠাতেন তারপর দুই হাঁটু উঠাতেন। অপরদিকে সুনানে আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদীছগ্রন্থে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْجَمَلِ وَلَكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ

তোমাদের কেউ যখন সাজদায় যাবে তখন উটের মতো করে বসবে না। তবে আগে দুই হাত রাখবে তারপর দুই হাঁটু রাখবে।

অবশ্য এর বিপরীত বর্ণনাও এসেছে। আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, এই হাদীছটি মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। (শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া (রহ), মাজমূ'উ ফাতাওয়া , খণ্ড ২২, পৃ. ৪৪৯)

প্রশ্ন-২ ঃ একজন ইমাম ওয়াজ করে বললেন যে, নামাযে চার আঙ্গুল ফাঁক করে দাড়ান হচ্ছে মাসনুন তরীকা। আবার অনেকে নিজের দু'পায়ের ফাঁকা লম্বা করে দু'জন মুসল্লির মধ্যকার ফাঁকা কমাতে চেষ্টা করেন। বিষয়টি হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

হারুনুর রশিদ খান

মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর ঃ দু'পায়ের মাঝখানে হাতের চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা করে দাঁড়ানো কাম্য বলে উল্লেখ করেছেন ইবন আবিদীন (র)। যুক্তি হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, আবু নাসর আদ-দাব্‌বূসী (র)-এ আমল করতেন। আর এটা খুশূ' খুযু'র অনুকুল। তিনি আরো লিখেছেন, পায়ের গোছার সাথে গোছা লাগিয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারে যে বর্ণনা এসেছে তার উদ্দেশ্য হলো জামা'আত অর্থাৎ জামা'আতে নামায আদায় করার সময় মুসল্লীগণ প্রত্যেকে পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর পায়ের সাথে লাগিয়ে দাঁড়াতেন (দেখুন, ইবন আবিদীন, ফাতওয়া শামী, ১খ, পৃ.৪৪৪)

ইবন আবিদীন এখানে দুটি মাসয়ালা বর্ণনা করেছেন।

এক. নামাযীর নিজের দু'পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল ফাঁকা করে দাঁড়ানো কাম্য।

দুই. জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার সময় মুসল্লীগণ প্রত্যেকে তাঁদের পা দু'খানা পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর পায়ের সাথে লাগিয়ে দাঁড়াতেন।

প্রথম মাসয়ালাটি একাকী নামায আদায়কারীর বেলায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি একাকী নামায আদায় করার সময় নিজ দু'পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল ফাঁকা করে দাঁড়াবে। এটাকে তিনি বাঞ্ছনীয় বা কাম্য বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটাকে কেউ কেউ মাসনূন বলেও দাবী করেছেন।

শাফিয়ীগণের মতে প্রত্যেক মুসল্লীর নিজের দু'পায়ের মাঝের ফাঁকার পরিমাণ হবে ১ বিঘত। আর বিনা ওযরে নিজের দু'পা এক সাথে মিলিয়ে দাঁড়ানো মাকরূহ। মালেকী ও হাম্বলীগণের মতে দু'পায়ের মাঝখানের ফাঁকা মাঝামাঝি পর্যায়ে রাখবে। দু'পা এক সাথে লাগিয়েও দাঁড়াবে না এবং অতিরিক্ত ফাঁকা করে দাঁড়াবে না।

দ্বিতীয় মাস'আলাটি জামা'আতের সাথে নামায আদায়কারীগণের বেলায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার সময় প্রত্যেক মুসল্লী একে অপরের পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দু'জনের মাঝখানের ফাঁকা বন্ধ করে কাতার সোজা করে দাঁড়াবে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ। কেননা শাইতান ছাগল ছানার মত দু'জনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যায়।

আমাদের মাসজিদগুলোতে লোকেরা এতটা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে দাঁড়ায় যে, তাতে মনে হয় অনেকেরই মাঝখানে শয়তান দাঁড়াবার জায়গা পেয়ে যায়। এ কারণে এ মাসয়ালার ব্যাপারে সচেতন মুসল্লীগণ নিজেদের দু'পায়ের মাঝখানে অস্বাভাবিকভাবে ফাঁকা বড় করে হলেও দু'জনের মধ্যকার ফাঁকা কমাতে চেষ্টা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মুতাবিক প্রত্যেক মুসল্লী একে অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা লাগিয়ে শাইতানের জন্য কোন জায়গা না রেখে দুজনের মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করে কাতার সোজা করে দাঁড়ালে এক দিকে সুন্নাত তরীকায় নামাযে দাঁড়ানো হবে। যেমন– লিখেছেন ফাতওয়া শামী গ্রন্থকার আল্লামা ইবন আবিদীন (র)। অপর দিকে দু'জনের মাঝখানের ফাঁকা বন্ধ করার জন্য কাউকে নিজের দু'পায়ের ফাঁকা বড় করার প্রয়োজন পড়বে না। সবাই স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে পারবে।

প্রশ্ন-৩ ঃ আমি হাদীসের মাধ্যমে জানতে পারলাম সন্তানের আকীকা করা সুন্নাত। অর্থাৎ না করলে অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন কোন বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যে সন্তানের মাতা-পিতা সন্তানের আকীকা করতে অবহেলা করবে ঐ সন্তান তার মাতা-পিতার জন্য কিয়ামাতের দিন সুপারিশ করবে না। এখন আমার প্রশ্ন হলো- এ কথা কি ঠিক? ঠিক না হলে সঠিক মত জানতে চাই।

মুহাম্মাদ মিনহাজুল ইসলাম
ওয়ার্লেস ঝাউতলা কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর ঃ আকীকা করা সুন্নাত। তবে 'আকীকা না করলে কোন অসুবিধা নেই' এ কথাটি পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ আকীকা না করলে অন্তত সুন্নাত পালন করা হলো না। আর সুন্নাত পালন না করাটাই তো একটা অসুবিধা। কোন কোন বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে আপনি যা লিখেছেন তা হাদীস নয় বরং তা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) কর্তৃক একটি হাদীসের অংশবিশেষের ব্যাখ্যা।

হাদীসটি হলো, প্রত্যেকটি সন্তান আকীকার বিনিময়ে বন্ধক রয়েছে। জন্মের সপ্তম দিনে

তার আকীকার পশু জবাই করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং মাথা মুণ্ডন করা হবে। –সুনান আবী দাউদ।

'প্রত্যেকটি শিশু সন্তান আকীকার বিনিময়ে বন্ধক রয়েছে' হাদীসটির এ অংশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) বলেন, যে সন্তান শিশুকালে আকীকা না করা অবস্থায় মারা যায় সে তার পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে না। –নাইলুল আওতার, ৫ম খ, পৃ-২২৫।

হাদীসের এ অংশের ব্যাখ্যায় কেউ বলেছেন, আকীকা করা জরুরী। অপর কেউ বলেছেন, আকীকার পশু জবাই করার পরই শিশুর নাম রাখতে হবে ও তার মাথার চুল মুণ্ডন করতে হবে (প্রাগুক্ত)। মুহাদ্দিসগণের এসব ব্যাখ্যা থেকে নবজাতকের আকীকার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। উপরোক্ত হাদীস মুতাবিক শিশুর আকীকা তার জন্মের সপ্তম দিনে করতে হবে। পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলে কোন কাজই সময় মত করা হয় না। আকীকা করতে অর্থেরও প্রয়োজন রয়েছে। তাই শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকেই তার আকীকা করার জন্য তার পিতা-মাতার পূর্ব পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। তাহলে আশা করা যায় সব পিতা-মাতাই সময়মত অর্থাৎ শিশুর জন্মের সপ্তম দিনেই নিজেদের সন্তানের আকীকা করতে পারবেন। এ দিনে আকীকা করা, শিশুর নাম রাখা ও শিশুর মাথা মুন্ডন করে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সাদকা করে দেয়া সুন্নাত।

আকীকা ছেলের জন্য দু'টি ছাগল (খাশি/পাঠি যা-ই হোক)। কারো দু'টি ছাগল আকীকা করার সামর্থ না থাকলে তার পক্ষে একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করলেও চলবে। আর মেয়ে সন্তানের আকীকার জন্য একটি ছাগল। আকীকার ছাগল বয়সে কুরবানীর উপযোগী হতে হবে। ছেলের আকীকার ছাগল এক রকম হবে এবং একই সাথে একটির পর অপরটি জবাই করা উত্তম। শিশু জন্মের সপ্তম দিনে কেউ আকীকা করতে অপারগ হলে চৌদ্দতম দিনে করবে। এদিনও যদি কেউ অপারগ হয় তাহলে একুশতম দিনে করবে। এদিনেও যদি কেউ অপারগ হয় তাহলে পরবর্তী যে কোন সময় করতে চাইলে করতে পারে।।

প্রশ্ন-৪ ঃ সুদ ও ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কি? আমাদের সমাজে দেখা যায় এক লোক অন্যলোককে টাকা ধার দেয়। যেমন চুক্তির মাধ্যমে কেউ ১০০০/- টাকা দিয়ে তার বিনিময়ে ২/৩ অথবা ৪/৫ মাস পরে ১০০০/- টাকা এবং ১ মণ ধান নিল। তা কি সুদের আওতায় পড়ে? পড়লে তার সমাধান কি? ইসলামী ব্যাংকিং-এর ৩টি বিষয় দেখলাম (১) বায়ে সালাম, (২) মুরাবাহা ও (৩) বায়ে মুয়াজজাল। এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যাসহ উপরোল্লেখিত প্রশ্নটি কোন পর্যায়ে পড়ে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

মু. আনোয়ারুল হক, সালেপুর
আউষপাড়, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ সুদ ও ব্যবসা কাকে বলে, এ দুটি কারবারের মধ্যে পার্থক্য কি? তা এ কারবার দু'টির সংজ্ঞার মাধ্যমে আশা করা যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ব্যবসার আরবী প্রতি শব্দ হলো বাই‘ ও তিজারাহ।

বাই‘ এর আভিধানিক অর্থ হলো বিনিময়, বদলা, বদলি।

পারিভাষিক অর্থ: ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মালের বিনিময়ে মাল অথবা মুদ্রার বিনিময়ে মাল ক্রয়-বিক্রয় করা। এতে একজন মালের ও অপরজন মুদ্রার অন্য মালের মালিক হয় এবং এতে মালের বিনিময়ে মাল অথবা মালের বিনিময়ে মুদ্রা লেনদেন হয়। এ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে বিনিময়বিহীন কোনো মাল বা মুদ্রা থাকবে না।

তিজারাহ ঃ কোন পণ্য খরীদ করে তা মুনাফায় বিক্রি করা অথবা মুনাফার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তুর রূপান্তর করা।

সুদ ঃ সুদ এর আরবী প্রতিশব্দ ‘রিবা’ রিবা অর্থ অতিরিক্ত। রিবা দু’প্রকার- রিবা আল ফাদল ও রিবা আন নাসিয়া।

এক. রিবা আল ফাদল বলা হয় মালের পরিবর্তে মাল লেনদেন কালে অতিরিক্ত যা গ্রহণ করা হয় যার কোনো বিনিময় বা বদল নেই সেই অতিরিক্ত পরিমাণটাই সুদ। যেমন এক মন গমের বিনিময়ে দেড়মন গম গ্রহণ করা। এখানে অতিরিক্ত আধা মণ গম সুদ হিসেবে গণ্য হবে। এখানে রিবা আল ফাদল এর আরো দু’একটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো, যেমন শরী‘আতসম্মত বিনিময় ছাড়াই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যে বর্ধিত মাল গ্রহণ করা হয় তাকে সুদ বলে। অথবা চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের মধ্যে যে কোনো একপক্ষ শর্ত মুতাবিক লেনদেনে শরীআতসম্মত বিনিময় ছাড়াই যে বর্ধিত মাল প্রদান বা গ্রহণ করে তাকে সুদ বলে।

দুই. রিবা আন নাসিয়াহ বা মিয়াদী সুদ। এটা ইসলাম বিরোধী অর্থ ব্যবস্থায় সর্বাধিক প্রচলিত। আলকোরআনুল মাজীদে সরাসরি একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য একে রিবা আলকোরআনও বলা হয়। ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগে রিবা আন নাসিয়ার প্রচলন ছিল তাই একে রিবা আল জাহিলিয়াও বলা হয়।

রিবা আন নাসিয়ার সংজ্ঞা ঃ ঋণ গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে অতিরিক্ত পরিমাণ মালসহ যে ঋণ প্রদান করতে হয় তাকে রিবা আন নাসিয়াহ বলে। অথবা চুক্তির শর্ত মুতাবিক মিয়াদকালের বিপরীতে শরী‘আতসম্মত বিনিময় ছাড়াই যে বর্ধিত মাল প্রদান বা গ্রহণ করা হয় তাকে রিবা আন নাসিয়াহ বলে। হাদীসে এর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে ‘কুল্লু কারদিন জররা মানফা‘আতান ফাহুয়া রিবা’ অর্থাৎ যে সব ঋণ মুনাফা টানে বা যে ঋণের সাথে মুনাফা যুক্ত হয় তাই সুদ। সার কথা হলো কাউকে ঋণ দিয়ে প্রদত্ত ঋণের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা সুদ।

ব্যবসা ও (উভয় প্রকার) সুদের সংজ্ঞা বর্ণনা থেকে আশা করা যায় ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া আল্লাহ তা‘আলা ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। অতএব এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

চুক্তির মাধ্যমে কাউকে এক হাজার টাকা ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে ২/৩ অথবা ৪/৫ মাস পর এক হাজার টাকা ও একমণ ধান বিনিময় ছাড়া নেয়া হলো। কাজেই এক মণ ধান সুদ

হিসেবে গণ্য হবে এবং এ লেনদেন সুদী লেনদেন হবে। এটা সুস্পষ্ট হারাম কাজ। এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকাই এর একমাত্র সমাধান। এ লেনদেন ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাই' সালাম, বাই' মুরাবাহা ও বাই' মুয়াজ্জাল এর কোনটার পর্যায়েই পড়ে না। কেননা এগুলো ব্যবসা ও হালাল এবং প্রশ্নে উল্লেখিত লেনদেনটি হলো সুদ ও হারাম। বাই' সালাম হলো মূল্য নগদ প্রদান করা এবং পণ্য বাকী থাকা যা চুক্তি মাফিক মেয়াদান্তে পরিশোধ করা হয়। এ ব্যয়-এর জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়। বাই' মুরাবাহা হলো, ক্রয় মূল্যের ওপর লাভযুক্ত করে বিক্রি করা। এতে ক্রয়মূল্যও সংযুক্ত লাভ ক্রেতাকে অবহিত করতে হয়। এটা নগদ ও বাকী উভয় প্রকার বেচা- কেনা করা যায়। বাই' মুয়াজ্জাল হলো পণ্য নগদ প্রদান করা ও মূল্য বাকীতে পরিশোধ করার শর্তে ক্রয় বিক্রয় করা। ■

ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

প্রকাশিত হলো-

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা

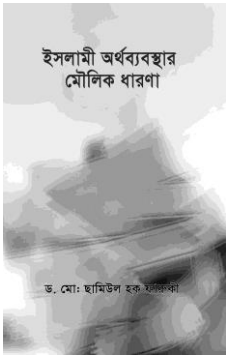

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www. dhakabic.com,

E-mail : dhakabic@gmail.com